অনুরাগিণী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড • কলিকাতা বারো

অনুরাগিণী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড * কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর: দেবদাস নাথ, এম-এ, বি এস
সাধনা প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড
৭৬ বৌবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ:
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দু টাকা

শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুচরিতাসু

লেখকের অন্যান্য বই

দেহমন

সঙ্গিনী

গোধূলি

দূরভাষিণী

চেনামহল

হলদে বাড়ি

মলাটের রং

ধূপকাঠি

কাঠগোলাপ

অক্ষরে অক্ষরে

উল্টোরথ

দ্বীপপুঞ্জ

উপনগর (যন্ত্রস্থ)

কন্যাকুমারী

অনুরাগিণী

একটু আগে রোদ ছিল, আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মুষলধারায় জোরালো বৃষ্টি নয়, টিপ-টিপ বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে অল্প অল্প ভিজছে রাসবিহারী এভেনিউ। ভিজতে ভিজতে, হাসতে হাসতে গেল কয়েকটি তরুণী মেয়ে। ট্রামটা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সরে যাওয়ার পর ভিজে গাছপালা নিয়ে আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল দেশপ্রিয় পার্ক। কালো দোতালা সরকারী বাসটায় পলকের জন্য ফের ঢাকা পড়ে গেল। শরতের শুরুতে এই টিপ-টিপ বৃষ্টিতে, ছুটির দিনের বিকেলের এই ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টিতে বাসটার চেহারাও যেন পালটে গেছে। রঙ পালটে গেছে, রূপ পালটে গেছে। নাকি কিছুই বদলায় নি, শুধু মন বদলেছে, মেজাজ বদলেছে প্রদোষ বোসের। ভারি ভালো লাগছে তার। আর সেই ভালো লাগার রঙ লেগেছে পৃথিবীতে, সে রঙ টিপ–টিপ বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় নি, আরো গাঢ় হয়েছে।

আবার বোধ হয় চাকা ঘুরল। সুদিনের মুখ আবার উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। সমস্যামূলক দু-দুখানা সামাজিক ছবি ফ্লপ করবার পর নিউ ক্যালকাটা পিকচার্সের ভক্তিমূলক পৌরাণিক চিত্র 'প্রহ্লাদ' দারুণ হিট করেছে। প্রডিউসার রাইমোহন কুণ্ডুর মুখে আবার হাসি ফুটেছে। কোম্পানির যারা স্থায়ী কর্মী তারা ফের মাইনে পেতে শুরু করেছে। দু-মাস ধরে নিয়মিত মাইনে পাচ্ছে আর্ট-ডিরেক্টর প্রদোষকুমারও। কোম্পানি আবার নতুন ছবি তোলার তোড়জোড় করছেন। 'সুরথযজ্ঞ'

আর 'দক্ষিণেশ্বরের' মধ্যে দোল খাচ্ছেন প্রডিউসার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী নিয়ে যদিও একাধিক ছবি হয়ে গেছে, তবু ডিরেক্টর ভরসা দিচ্ছেন, নতুন টেকনিকে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ছবি তুলবেন। যাই হোক, প্রডাকশন আর বন্ধ থাকবে না, কাজকর্ম পুরোদমে চলবে। আর তাই চললেই মাইনেটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে প্রদোষ।

ছবিগুলি ফ্লপ করলেও আর্ট-ডিরেক্টরের কাজের কেউ নিন্দা করে নি। বরং দৈনিক, সাপ্তাহিকের ক্রিটিকরা, সাধারণ চিত্রামোদীরা প্রদোষের কাজের কেউ নিন্দা করেন নি, বরং সুখ্যাতিই করেছেন।

আধুনিক ছবি, পৌরাণিক ছবি, প্রণয়মূলক ছবি, ভক্তিমূলক ছবি, সব ছবিরই সেটের কাজ ভালো হয় প্রদোষের। একেবারে নিখুঁত না হলেও খুঁত কম থাকে। গরিবের কুঁড়েঘর থেকে লক্ষপতির রাজপ্রাসাদ তৈরির কাজে সমান দক্ষতার পরিচয় দেয় প্রদোষ। আসবাবপত্রের খুঁটিনাটিতে তার ভুল হয় না। বরং বাস্তববোধ প্রখর হয়ে ওঠে। অভিনেতা অভিনেত্রীদের পরিচ্ছদ নির্বাচনেও প্রদোষের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক চিত্রে নায়কের কাঁধে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে চাদর থাকবে কি থাকবে না, নায়িকাকে কখন বেণীতে মানাবে, কখন এলো খোঁপায়, মিলনের মুহূর্তে তার শাড়ির রং চড়া হবে কিনা এই নিয়ে খোদ ডিরেকটারের সঙ্গে, হেড মেকআপ-ম্যানের সঙ্গে তাকে প্রায়ই তর্ক করতে হয়। ডিরেক্টর যেখানে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন, বেশির ভাগ সময় দেখা যায় সেখানেই কাজ খারাপ হয়েছে। নিজের ক্ষেত্রে প্রদোষের শিল্পবোধ যে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য একথা আজকাল সবাই স্বীকার করেন। শুধু নিজেদের কোম্পানিতে নয়, বাইরেও সুনাম হয়েছে প্রদোষের। সুখ্যাতি ছড়াচ্ছে। বাণী পিকচার্স আর রূপলোক লিমিটেডের সঙ্গে গোটা দুই

কণ্ট্রাক্ট হয়তো শিগগিরই হবে প্রদোষের। তাকে অন্য জায়গায় কাজ করতে দিতে রাইমোহনবাবু অমত করেন নি। বছরখানেক ধরে নিয়মিত মাইনে না পাওয়ায় প্রদোষ খুবই অসুবিধেয় পড়েছে। ধারদেনা জমেছে অনেক। সেগুলি শোধ দিতে হবে তো।

কণ্ট্রাক্টগুলি হয়ে গেলে দেনার জন্য ভাবে না প্রদোষ। দেনা শোধ হয়ে যাবে। তাছাড়া এ লাইনে সবারই কিছু না কিছু ধারদেনা থাকে। এ বাজারে যার যত ধার তার বুদ্ধির ধার তত বেশি।

ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে পা দুটো আরও একটু সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল প্রদোষ। বাইরে এখনও বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। কিন্তু সে শব্দ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আর একটি মধুরতর ধ্বনিতে। পাশের বড় ঘরটায় ঘুঙুর বাজছে। হাতে তালি দিয়ে দিয়ে তাল শুধরে দিচ্ছে 'এক দুই তিন, এক দুই তিন'। মুখে মুখে বোল বলে দিচ্ছে, 'ধিৎ তা ধিন না, ধিৎ তা ধিন না, ধিৎ তা ধিন না ধিৎ তা ধিন না ধা।' ছাত্রীদের নাচ শেখাচ্ছে শিখা। প্রদোষের যশস্বিনী নৃত্যকুশলা স্ত্রী দীপশিখা বসু। মনে মনে একটু হাসল প্রদোষ। শিখার নাম তার স্বামীর চেয়ে শহরে ঢের বেশি পরিচিত। শুধু নাম নয়, তার নয়নাভিরাম মূর্তিও। নানা নৃত্যভঙ্গিমায় বিভিন্ন কাগজে শিখার ছবি কতবার যে আর্টপ্লেটে ছাপা হয়েছে, কলকাতার অভিজাত ফটো স্টুডিওগুলির শো-কেশে শিখার কত নৃত্যপরা, স্মিতমুখী প্রতিকৃতি যে শোভা বাড়াচ্ছে তার ঠিক নেই। সেই তুলনায় প্রদোষকে আর কজনে জানে, কজনে চেনে, কজনেই বা দেখা পেতে চায়, অটোগ্রাফের খাতায় ধরে রাখতে চায় হাতের অক্ষর। কিন্তু এই মুহূর্তে নাচের বোল আর ঘুঙুরের শব্দের সবটুকুই মধুর শোনাচ্ছে না প্রদোষের কাছে। এই ছুটির দিনে বিকেলে এই টিপ-টিপ-বৃষ্টি-ঝরা বিকেল-বেলাতেও শিখার অবসর নেই, সে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তার একবারও

মনে পড়ছে না প্রদোষের কথা, একবারও ইচ্ছা করছে না স্বামীর কাছে এসে বসতে, তাকে একটু সান্নিধ্য দিতে, কি তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে। সেই শিখা আর নেই। দশ বছর আগে ওর মধ্যে যে প্রথম প্রণয়বহ্নি জ্বলে উঠেছিল তা আজ নিবু-নিবু। শিখা এখন শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি। শুধু ক্যারিয়ার-সাধিকা।

প্রদোষ একবার ভাবল তার স্ত্রীকে ডাকে। কিন্তু অত বোল আর ঘুঙুরের শব্দের মধ্যে স্বামীর ডাক কি শিখার কানে যাবে? কানে গেলেও সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা কম। শিখা হয়ত মুহূর্তের জন্যে একটু ভ্রূ কোঁচকাবে। তারপর ফের তার নিজের বোলে ফিরে যাবে, 'ধিৎ তা ধিন না, ধিৎ তা ধিন না, ধিৎ তা ধিন না ধা।'

'বাবুয়া, একা একা তুমি কি করছ? গান শুনছ?' স্ত্রী না এলেও প্রদোষের তিন বছরের দুরন্ত ছেলে বিচ্ছু দূর থেকে ছুটতে ছুটতে বাপের কোলের মধ্যে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আচমকা থুতনিতে একটু লেগে গেল প্রদোষের। কিন্তু যেন অনেক ব্যথা পেয়েছে তেমনি কাতর ভঙ্গি করে বলল, 'ঈস ঈস, গেছি গেছি। থুতনিটা তুই একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছিস বিচ্ছু।'

ছেলেকে হাসতে দেখে প্রদোষ দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল, 'উঁ উঁ উঁ। বিচ্ছু আমায় মেরেছে, উঁ উঁ উঁ।'

বিচ্ছু প্রথমে বাবার হাত ধরে টানাটানি করল, তারপর অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'আর মারব না বাবা, আর মারব না।'

প্রদোষ বলল, 'তাহলে আমাকে আদর কর, চুমু খাও।—উঁহু একগালে খেলে হবে না, দুই গালে।'

বিচ্ছু বাপের দুই গালে দুটি চুমু খেয়ে বলল, 'আর কাঁদে না বাবা, এবার হাস।'

প্রদোষ হেসে উঠে বলল, 'দুষ্টু ছেলে, তুমি বুঝি আমাকে ফরমায়েস দিয়ে হাসাবে। তুমি কি ডিরেক্টর হীরেন ঘোষাল এসেছ ?'

প্রদোষকে হাসতে দেখে বিচ্ছু আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ও ঘরে গান হচ্চে, না বাবা ?'

প্রদোষ হেসে বলল, 'গান নয়রে, নাচ। বোকা ছেলে। অত বড় আর্টিস্টের ছেলে তুই, নাচ আর গানের তফাত বুঝিসনে ? আচ্ছা বিচ্ছু, বড় হয়ে তুই কি হবি বল তো ? আমার মতো আর্ট-ডিরেক্টর হবি, না তোর মায়ের মতো নাচিয়ে হবি ?'

বিচ্ছু বলল, 'ব্যাটাছেলে বুঝি আবার নাচে ?'

প্রদোষ খুশী হয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ বাবা, নাচটা মেয়েলি আর্ট। তুমি তাহলে আমার মতো পুরুষ আর্টিস্ট, মানে আর্ট-ডিরেক্টর হবে। কি বল ?'

ততক্ষণে শিখা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী চেহারা। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। সুগঠিত সুঠাম গড়ন। বছর ছাব্বিশেক হয়েছে বয়স। কিন্তু দেখে উনিশ-কুড়ির বেশি বলে মনে হয় না। হাল্কা ধানী রঙের একখানা শাড়ি পরনে। কানে চুনী-বসানো ফুল, খোঁপায় গোঁজা একটি রক্ত গোলাপ। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। শুধু মুখের বোলে নয় ছাত্রীদের নেচেও দেখাচ্ছিল শিখা। কিন্তু এ অবস্থায় কি ওর নাচা উচিত ? মনে মনে ভাবল প্রদোষ।

শিখা বলল, 'কি আলাপ হচ্ছে ছেলের সঙ্গে ?'

বিচ্ছু বলল, 'নাচ ভালো না মা। থু-থু। মেয়েরা নাচে। ছেলেরা নাচে না, আমি তোমার মতো হব না মা। বাবার মতো হব।'

শিখা একটু হেসে বলল, 'ঈস, বাবার মতো হলেই হল ? কাল থেকে আমি তোমার বাবাকে সুদ্ধ নাচিয়ে ছাড়ব। তুমি আমার ছেলে

হয়ে আমার আর্টের নিন্দা কর, এত বড় স্পর্ধা তোমার? সব তোমার বাবার পরামর্শ। তোমার বাবা আমার আর্টকে মোটেই ভালবাসে না। দেখতে পারে না। বুঝেছ বিচ্ছু? তোমার বাবা ভারি হিংসুটে। আমি এর শোধ তুলব। কাল থেকে যদি ধেই ধেই করে তাকে না নাচাই—'

প্রদোষ হেসে বলল, 'সে আর নতুন কথা কি, সে তো প্রথম দিন থেকেই নাচাচ্ছে।'

আরো কি বলতে যাচ্ছিল প্রদোষ, শিখা ঠোঁটে আঙ্গুল ছোঁয়াল। পাশের ঘর থেকে তার ছাত্রীরা বেরিয়ে আসছে। ঘুঙুর খুলে বেশবাস ঠিক করে রীতি আর নীতি—ব্যারিস্টার নীলাদ্রি চাটুজ্যের দুই মেয়ে এসে দাঁড়াল। সুগলালিতা সুন্দরী দুটি যমজ বোন। ওদের ঠাকুরদা নাম রেখেছিলেন লক্ষ্মী-সরস্বতী। কিন্তু বাবা সে নাম পাল্টে রেখেছে। বছর ষোল বয়স হয়েছে দুজনের। বেশ ভালো স্বাস্থ্য, নিষ্ঠাও আছে। শিখা আশা করে এই দুটি ছাত্রী তার নাম রাখবে, গৌরব হবে তার।

রীতি বলল, 'যাই শিখাদি।'

শিখা বলল, 'আচ্ছা এস ভাই। আর এক কাপ করে কফি খেয়ে গেলে হত না? কি ওভালটিন? বড় টায়ার্ড হয়েছো তোমরা।'

নীতি বলল, 'না না ওসব আর দরকার হবে না। অমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। ড্রাইভার সুজন সিং রাগে গোঁফ ছিঁড়ছে বোধ হয়, চলি আমরা, চলি প্রদোষদা। আপনাদের নতুন ছবিতে আমাদের একটা চান্স টান্স দেবেন তো?'

প্রদোষ হেসে বলল, 'ও নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

শিখা ছাত্রীদের সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। নিচে ওদের বাড়ির বুইকখানা অপেক্ষা করছে। দরকার পড়লে চাটুজ্যে সাহেবের এ গাড়িখানা শিখাও মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু আজ

পর্যন্ত নিজের গাড়ি তার হল না; বাড়িই হল না, তার গাড়ি! শুধু যশ আর যশ। সম্পন্ন গৃহস্থ হওয়ার মতো অর্থ তাদের হয় নি, শিগগির যে হবে সে আশাও নেই। অনেক দেরি—এখনো অনেক দেরি। নিজের মনে একটু হাসল শিখা। দেরি মানে? কোনদিনই হয়তো হবে না। মাসে তিন শ টাকা মাইনে পায় প্রদোষ। বছরের মধ্যে তাও আবার ছমাস বাকি পড়ে। নেহাত শিখার মতো চালাক মেয়ে বলেই নিজেদের সংসার আর খাওয়া-পরাটা কোন রকমে চালিয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, নিজেদের দারিদ্র্যকে লোকচক্ষু থেকে আড়াল করে রেখেছে, কাউকে বুঝতে দেয় নি, তারা কত গরিব। নাচের ছন্দে, ঘুঙুরের শব্দে দৈন্যকে ঢেকে দিয়েছে শিখা। না, বাড়ি গাড়ি বিলাস ঐশ্বর্য কিছুই চায় না সে। যদি চাইত তাহলে সে সব ছেড়ে আসবে কেন। শুধু নিজের আর্টকে চায় শিখা। মন প্রাণ ঢেলে দিতে চায় আর্টের কাছে। কিন্তু তাই বা হয়ে ওঠে কই। তার দেহমনের আর একজন ভাগীদার আছে যে। তার শিল্প-দেবতার আছে আর এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। সে তার স্বামী প্রদোষ। অথচ আশ্চর্য, প্রদোষ নিজেও একজন আর্টিস্ট, নিজেও শিল্পের পূজারী।

শিখা ফিরে এল স্বামীর কাছে। প্রদোষ আবার বিচ্ছুকে কোলে টেনে নিয়েছে। শিখা একটু বিরক্ত হয়ে রূঢ় ভঙ্গিতে বলল, 'ছেড়ে দাও ওকে। ছেলে-পুলেকে বেশি আদর দেওয়া ভালো না।'

প্রদোষ বলল, 'ওকে আমার কাছে দেখলেই তুমি ওরকম কর। ছেলেকে নিজেও ভালবাসবে না, যত্ন করবে না, আবার আমি যে একটু কাছে ডাকব, আদর করব তাও তোমার সহ্য হবে না।'

শিখা জ্বলে উঠে বলল, 'তা হবে কেন। ও যে আমার সতীনের ছেলে।'

প্রদোষ বলল, 'সতীনের ছেলের সঙ্গেও কেউ অমন ব্যবহার করে না।—নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ—হয়ে থাকাই উচিত ছিল তোমার।'

শিখা বলল, 'আমি তো তাই চেয়েছিলাম। তুমিই তো থাকতে দিলে না।—'

'পদ্মা, পদ্মা।'

চেঁচিয়ে ঝিকে ডাকল শিখা।

পদ্মা সাড়া দিয়ে বলল, 'যাই দিদিমণি।'

শিখা বিকৃত স্বরে তার অনুকরণ করে বলল, 'যাই দিদিমণি! তুই কোথায়? কি করছিস ওখানে বসে-বসে?'

পদ্মা প্রতিবাদ করে বলল, 'আমি কি বসে আছি নাকি দিদিমণি? রাত্রের রান্নাবান্না করতে হবে না?'

শিখা বলল, 'কথার বহর দেখ। দরকার নেই তোর রান্নাবান্না করার। আমি হোটেল থেকে ভাত-তরকারি আনিয়ে নেব। তুই এদিকে আয়।'

পদ্মা এবার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার হাতটা ময়লা। উনুন থেকে ছাই বার করছিল।

বাইশ-তেইশ বছর বয়স হয়েছে পদ্মার। দেখতে কালো হলেও চোখ-মুখে শ্রী আছে। জয়নগর অঞ্চলের মেয়ে। অল্পবয়সে স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর থেকে মহেশের আর কোন খোঁজ-খবর নেই। স্টুডিওর যুগল মিস্ত্রি এই অনাথা মেয়েটির খোঁজ এনে দিয়েছিল প্রদোষকে। বলেছিল. 'রাখবেন বাবু মেয়েটাকে? কেউ নেই। দুবেলা দুমুঠো ভাত আর বছরে দুজোড়া মোটা শাড়ি, এই দিলেই হবে। মাইনেপত্তর কিছু দিতে হবে না।'

প্রদোষের পুরোন ঝি তখন ঝগড়া করে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে

গেছে। কাজকর্ম করতে ভারি কষ্ট হচ্ছে শিখার। যুগলের প্রস্তাবে তাই সানন্দে রাজী হয়েছিল প্রদোষ, কিন্তু বিনা মাইনেয় রাখতে মন সরে নি। খোরাক-পোশাক ছাড়াও পাঁচ টাকা মাইনে ঠিক করে দিয়েছিল। বেতন বৃদ্ধি হতে হতে দশে গিয়ে পৌঁছেছে।

নাম ছিল পদ্মবালা। শিখা সেই নামের সংস্কার করে করেছে পদ্মা। শুধু নামটাই মার্জিত করে নি, মেয়েটিকেও ঘষে-মেজে চলনসই করে নিয়েছে। শাড়ি পরবার ধরন, জুতো পরবার ধরন, চুল বাঁধবার ধরনে সহজে কেউ বুঝতে পারে না পদ্মা ভদ্র ঘরের মেয়ে নয়। রান্না-বান্না ঘরকন্না এমনকি বিচ্ছুকে নাওয়ানো খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানোর ভার পর্যন্ত পদ্মার হাতে। শিখা তাকে বাঙলা লেখাপড়াটাও মোটামুটি শিখিয়েছে। যাতে বাইরের একজন লোক এলে তার সঙ্গে কথা বলতে পারে, মুদি দোকানের, স্টেশনারি দোকানের বিলের টাকা মিটিয়ে দিয়ে খুচরো ব্যালান্সটা হিসাব করে গুনে নিয়ে আসতে পারে সেটুকু বিদ্যাবতী তাকে করে তুলেছে শিখা। বাড়ির কুকুর-বিড়াল, ঝি-চাকর আর দারোয়ান গৃহস্থের রুচি আব সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। চাকর দারোয়ান তো নেই শিখাদের। একমাত্র পদ্মাই সম্বল। তার হাতে শিখার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। চলন-বলনের দিক থেকে মেয়েটি ভালোই। কিন্তু সব চেয়ে বিরক্তি লাগে, আজকাল কড়া কথা মোটেই সহ্য করতে পারে না পদ্মা। মুখে মুখে জবাব দেয়। তারপর অভিমান করে মুখ ভার করে থাকে। হয়তো দু-এক বেলা না খেয়েই কাটিয়ে দেয়। বিরক্তির একশেষ!

কিন্তু শিখা ওর সঙ্গে বেশি বকাবকি করে প্রদোষ তা মোটেই চায় না। আহা, গরিবের ঘরের স্বামীহারা মেয়ে। একটু মিষ্টি মুখে ওর সঙ্গে কথা বললেই হয়। স্বামীর এই সব কথার জবাবে শিখা বলে,

'আমার মুখে অত মিষ্টি নেই। তোমার যে আছে তাই যথেষ্ট। তোমার সঙ্গে ভাব, আমার সঙ্গে ঝগড়া এইটাই ভালো। উল্টোটা হলেই বরং আপত্তি হত। ওকে এমনভাবে শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরি করে দিচ্ছি আমি যদি হঠাৎ মরেও যাই সঙ্গে সঙ্গেই তোমার ঘটক ডেকে বিয়ে করতে হবে না। ওকে দিয়েই সংসার কিছুদিন চালিয়ে নিতে পারবে।'

বলতে বলতে দুষ্টুমির ভঙ্গিতে হাসত শিখা। প্রদোষ চটে উঠত, 'কি যে বাজে ঠাট্টা ইয়ার্কি কর আমার ভালো লাগে না।' শুধু ঝি আর রাঁধুনিই নয়, পদ্মাকে নির্যাতিতা দুঃখিনী নারীর মডেল হিসেবেও মাঝে মাঝে ব্যবহার করে প্রদোষ। দাদাবাবু যে মনোযোগ দিয়ে তার ছবি আঁকছে এতে পদ্মা খুব খুশী হয়। ব্যাপারটাকে বড় একটা উপরি পাওনা বলে মনে করে পদ্মা। কিন্তু শিখার ঠাট্টা-তামাসা তাতে বাড়ে। আর সে তামাসায় কৌতুকের চেয়ে ঝাঁজ থাকে বেশি।

পদ্মা কাছে এসে দাঁড়াতে শিখা কড়া হুকুমের স্বরে বলল, 'ছেলেটাকে এখান থেকে নিয়ে যা তো। একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আয়।'

পদ্মা বলল, 'এই বৃষ্টির মধ্যে ওকে কোত্থেকে ঘুরিয়ে আনব দিদিমণি! কি যে বলেন আপনি।'

শিখা চটে উঠে বলল, 'থাক থাক, আমার কাজের সমালোচনা তোকে করতে হবে না। তা তো দিনরাতই করিস, দিনরাতই শোনাস। তোকে কি আমি এই বৃষ্টির মধ্যে বাইরে যেতে বলেছি? অন্য ঘর-টর থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আয়। পুলাদের ফ্ল্যাটে নিয়ে যা।'

বিচ্ছু বলতে লাগল, 'আমি যাব না, কিছুতেই যাব না। বাবা দেখ আমাকে জোর করে নিয়ে যায়।'

কিন্তু বিচ্ছুর কান্না শুনেও প্রদোষ কোন বাধা দিল না। কোন কথা বলল না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুপচাপ বসে রইল।

পদ্মারা চলে যাওয়ার পর প্রদোষ বলল, 'তুমি যেন ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ শিখা।' শ্রীনিকেতন থেকে কেনা চামড়ার ছাউনি দেওয়া, কারুকাজ-করা একটি মোড়া ঘর থেকে নিজেই হাতে করে নিয়ে এল শিখা, বারান্দায় স্বামীর ইজি-চেয়ারের পাশে এসে বসে বলল, 'আমার সীমা ছাড়াবার কথা তো রোজই শোনাচ্ছ, কিন্তু আমার কথাটা কি ভেবে দেখেছ? আমার কোন অনুরোধই কি তুমি রাখবে না ঠিক করেছ?'

প্রদোষ বলল, 'কোন্ অনুরোধের কথা বলছ?'

শিখা স্বামীর দিকে তাকাল, 'আর কতবার বলব? এই আমার শেষ অনুরোধ। এ যে conception তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। ডাঃ সোম তা স্পষ্ট করেই বলে দিলেন।'

প্রদোষ একটু হাসল, 'ডাক্তার না হয়েও, আর নিজে conceive না করেও সে কথা আমি তোমাকে শুরুতেই বলেছি।'

শিখা বলল, 'বলেছ। কিন্তু কোন ব্যবস্থা কর নি।'

প্রদোষ বলল, 'কি ব্যবস্থা করব। এই তো বোধ হয় third month চলছে।'

শিখা বিরক্ত হয়ে বলল, 'মাসের হিসেব তোমাকে করে দিতে হবে না, তা আমি জানি।'

প্রদোষ বলল, 'আমি বলেছিলাম হসপিটালে যেতে। আগে থেকেই একটা কার্ড টার্ড করিয়ে রাখলে সুবিধে হত। অবশ্য তোমার বেলায় কোনই অসুবিধে নেই। তুমি যখনই চাইবে, তখনই ভর্তি হতে পারবে। সবাই তো চেনা-শোনা।

শিখা আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'দেখ, তোমার সব সহ্য করতে

পারি, কিন্তু ন্যাকামি আমি কিছুতেই সইতে পারি নে। তুমি জানো আমি কি চাই। তুমি জানো আমি হাসপাতালে যেতে চাই নে, চাই নে, চাই নে।'

প্রদোষ এবার তীব্র স্বরে বলল, 'কিন্তু তুমি যা চাও তাতে কিছুতেই আমি সায় দিতে পারব না। ethical প্রশ্নের কথা আমি ধরি নে। কিন্তু যা unhygienic unscientific—'

শিখা বলল, 'থামো, আর বক্তৃতা করতে হবে না তোমাকে। সব ব্যাপারেই তুমি যে কত সায়ান্স আর হাইজিন মেনে চল তা আমার জানা আছে। আমার বেলাতেই তুমি ধর্মধ্বজ হয়ে উঠেছ। অথচ আগাগোড়া তুমিই এর জন্যে দায়ী। তুমি অসতর্ক বলেই এমন হয়েছে। তার পরেও তুমি আমাকে কোন সাহায্য করছ না। বরং পদে পদে বাধা দিচ্ছ। তোমার ইঙ্গিতে, তোমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই ডাঃ সোম আমাকে প্রথম থেকে ব্লাফ দিচ্ছে, তা আমি জানি। ভেব না কলকাতা শহরে তোমার বন্ধু সোম ছাড়া আর ডাক্তার নেই। ভেব না আমি অসহায়, তোমার সাহায্য ছাড়া আমি এক পাও চলতে পারব না।'

প্রদোষ বলল, 'তা যে পার, আমি জানি। কুপরামর্শ দেওয়ার, কুপথে টেনে নেওয়ার মতো বন্ধুর তোমার অভাব নেই। তুমি ভালো করে ভেবে দেখ—'

শিখা চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখেছি, দেখেছি, হাজার বার দেখেছি। টের পাওয়ার পর থেকে এই দুমাস ধরে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আমি ভাবছি, সব তোমার চক্রান্ত, তোমার ষড়যন্ত্র, তুমি চাও আমি একপাল ছেলেপুলের মা হয়ে তোমার ঘরে চুপ-চাপ বসে থাকি। তুমি চাও না আমার ক্যারিয়ার বলে কিছু থাকে, তুমি চাও না আমার আরো নাম হোক, আরো খ্যাতি হোক। তুমি আমার আর্টকে চাও না।

কিন্তু আমি চাই, আমি একমাত্র আর্টিস্ট হতে চাই আর কিছু চাই নে।' তীব্র বেগে উঠে দাঁড়াল শিখা। পা দিয়ে মোড়াটাকে ঠেলে ফেলে ঘরের মধ্যে চলে গেল। যে নৃত্য-ভঙ্গিমা তার চলার ছন্দে প্রকাশ পেল তাকে তাণ্ডব নৃত্য বলা যায়।

যে বৃষ্টিভেজা বিকেলকে মধুর মনে হয়েছিল প্রদোষের, এখন তার রূপ বদলে গেছে। বৃষ্টি তো নয়, বিষাক্ত রক্তের ধারা। সেই যে গা ছেড়ে নেমেছে আর কখন থামবে ঠিক নেই। না থামে না থামুক। ওয়াটারপ্রুফটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদোষ। রিজেণ্ট পার্কে নতুন বাড়ি তুলেছে অভিনেত্রী বিশাখা অধিকারী। শোনা যাচ্ছে সে আর তার স্বামী অমরেশ দুজনে মিলে প্রযোজনায় নামছে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেডের আর্টিস্ট আর টেকনিসিয়ানদের ভিড় হচ্ছে তাদের ড্রয়িং-রুমে। সান্ধ্য মজলিস বেশ জমে উঠেছে। বিশাখা চা দিচ্ছে, কফি দিচ্ছে, এমনকি বন্ধুদের জন্যে ব্রীজ খেলার আসর করে দিচ্ছে; কিন্তু প্রডাকশনের কথায় কান দিচ্ছে না। সে কথা কেউ তুললে বলছে, 'ক্ষেপেছ? ছবি তুলব, অত টাকা পাব কোথায়? যা বাজার। আজকাল ছবি করা মানে তো ফাটকাবাজির সমান। শেষে কি সব খোয়াব? নীলামে তুলব নিজেকে? তাও তুলতে পারি কিন্তু অমরেশের দশা কি হবে?'

আবার ভিতরে ভিতরে বই বাছাবাছি, ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো—সবই যে চলছে, প্রদোষ সে খবর রাখে।

বিশাখা একদিন তাদের স্টুডিওতে বেড়াতে এসে বলেছিল, 'যদি কিছু করি তোমার সাহায্য নিয়েই করবো।' গোড়াতে কনট্রাক্ট পাওয়ার ব্যাপারে প্রদোষও তাকে কম সাহায্য করে নি। সে কৃতজ্ঞতার ছিটেফোঁটা যদি বিশাখার মনে থেকে যায় তো থাকতেও পারে।

ব্রীজের আসর ভাঙতে ভাঙতে রাত এগারটা হল। আজ পার্টনার হিসেবে বিশাখা নিজে বসেছে তার সঙ্গে। বার বার তার কাছে ধমক খেল প্রদোষ। বিশাখা বলল, 'যাই বল, খেলায় তোমার আজ মন নেই। তুমি বউয়ের কথাই ভাবছ। তোমার মতো এমন একটি পত্নীপ্রেমিক আমি আর দেখি নি।'

প্রদোষ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কেন অমরেশ কি স্ত্রীভক্তিতে কিছু কম যায়?'

বিশাখা বলল, 'তোমার অনেক নিচে, অনেক নিচে। তোমাকে বলে রাখছি প্রদোষ, এর পর থেকে তুমি কিন্তু বিনা পাসপোর্টে আমাদের বাড়িতে ঢুকতে পারবে না, যখনই আসবে শিখাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস। নইলে তোমাকে পাব, তোমার মন পাব না।'

ফ্লার্ট করতে বিশাখার জুড়ি নেই। ওর আলাপ মানেই প্রেমালাপ। ওর অভিনয়টা সেটের চেয়ে সেটের বাইরেই যেন জমে ভালো।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে এগারটা হল, দোতলায় তাদের তিন নম্বর ফ্লাট ছাড়া আর কোন ফ্লাটেই আলো জ্বলছে না। এবাড়ির সবাইরই একটু সকাল সকাল ঘুমবার অভ্যাস। অথচ বেশি রাত ছাড়া প্রদোষের ঘুম আসে না। রাত জেগে সে আগে পড়াশুনো করত, ছবি আঁকত। আজকাল আর সে পাট নেই। শিখার সঙ্গে কোনদিন বা স্টুডিওর কাজ কর্ম নিয়ে, কোনদিন বা নাচের প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করতে থাকে। শুনতে শুনতে শিখা আগে ঘুমিয়ে পড়ে তারপরে প্রদোষ।

পদ্মাই এসে দোর খুলে দিল। মুখখানা গম্ভীর। প্রদোষ বলল 'ব্যাপার কি, ঝড়বৃষ্টি আর একপশলা হয়ে গেছে বুঝি?'

পদ্মা বলল, 'হুঁ। কিছুতেই খেলেন না। রাগ করে নাচের ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে শুয়ে আছেন।'

বেশ কিছুদিন ধরেই নাচের-ঘর গোসা-ঘর হয়েছে শিখার। ঝগড়া-ঝাঁটি হলেই সেই ঘরে গিয়ে সে খিল দেয়। আগে খুব সাধাসাধি করত প্রদোষ। চেষ্টা-চরিত্র করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনত। কিন্তু আজকাল আর ধৈর্য নেই প্রদোষের। বিরক্তি ধরে গেছে মনে। রুদ্ধ দরজায় দু-তিনটে টোকা দিল প্রদোষ। নাম ধরে ডাকল বার তিনেক 'শিখা, শিখা, শিখা।' নিজেই বুঝতে পারল প্রত্যেকটি ডাকের সঙ্গে তার অসহিষ্ণুতা, রাগ, বিদ্বেষ ফুটে উঠছে, ফেটে পড়ছে।

আস্তে আস্তে ফিরে এল প্রদোষ। কাপড় ছাড়ল। বাথরুমে ঢুকে ঠাণ্ডা জল দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফেলল। তবু যেন ভিতরের তাপ যেতে চায় না।

টেবিলে ভাত ঢাকা রয়েছে দুজনের। প্রদোষ আজ নিঃশব্দে একাই খেয়ে নিল। কতদিন যে শিখার ভাত এমন নষ্ট হয় তার ঠিক নেই। কত কষ্টে এই অন্ন সংস্থান করতে হয়। কত হাজার হাজার লোক কষ্ট করেও দুমুঠো ভাতের সংস্থান করতে পারে না।

হাই স্কুলের টিচার বন্ধু পরিমলের কথা মনে পড়ল প্রদোষের। দাম্পত্য-জীবনের বিড়ম্বনা নিয়ে আলোচনার সময়ে সে বলেছিল, 'তোমার অবস্থা বুঝতে পারি প্রদোষ, খুবই বুঝতে পারি। একে মনসা তাতে ধুনোর গন্ধ। একে বউ তাতে আবার আর্টিস্ট। সাধারণ স্ত্রী নিয়ে ঘর করতেই আমাদের মাসের মধ্যে ঊনত্রিশ দিন ফাটাফাটি হয়ে যায়। তোমার তো আবার নৃত্যকালী। এক কাজ করো। শিব হয়ে মেঝের ওপর পড়ে থেকে শ্মশানেশ্বরীকে নাচতে দাও। তাতে যদি সম্বিৎ ফেরে, জিব কেটে দু-একবার লজ্জা জানায়। পুরুষের আদর্শ শিব। পুরাণকার অনেক দিন আগেই পথ বাতলে দিয়ে গেছেন।'

বাপের খাটেই বিচ্ছু রয়েছে। ছোট পাশ-বালিশটি জড়িয়ে ধরে শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। ওরাই সুখী। নিশ্চিন্ত মধুর শৈশব। মনে মনে ভাবল প্রদোষ। একটু যেন হিংসা করল ছেলেকে।

শুতে যাওয়ার আগে তার চোখ পড়ল শিয়রের কাছে দেওয়ালে টাঙানো বড় অয়েল-পেন্টিংখানার ওপর। শিখা। তার দীপশিখা। নৃত্যের ভঙ্গিমায় স্ত্রীর অনেক ফটো তুলেছে, অনেক ছবি এঁকেছে। এ-ঘরে ও-ঘরে এখনো টাঙানো আছে তার দু চারখানা। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে অনেক যত্ন করে আঁকা প্রদোষের এই রূপশিখা কোন নৃত্যশিল্পীর প্রতিরূপ নয়, স্মিতমুখী এক গৃহলক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি। তার সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে কাঁকন। মাথায় অল্প একটু আঁচল তোলা। আনত চোখ দুটিতে লজ্জা। মুখে স্নিগ্ধ লাবণ্য।

প্রদোষ আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। তারপর গভীর আবেগে চুম্বন করল সেই প্রতিকৃতির ওষ্ঠাধরে, যে অধর একই সঙ্গে তার গৃহলক্ষ্মীর আর কলালক্ষ্মীর।

পরদিন ভোরে চায়ের টেবিলে ফের দুজনে বসল মুখোমুখি। বিচ্ছুকে গরম দুধ খাওয়াল পদ্মা। কিন্তু ছেলের আবদার, সেও টেবিলে বসে চা খাবে।

প্রথমে প্রদোষই কথা শুরু করল। মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল, 'কি যে তোমার মেজাজ হয়েছে আজকাল। সারারাত তো না খেয়েই কাটালে। তার ওপর ওই শক্ত মেঝেয় শুয়ে শুয়ে—'

কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেলেও আজকের ভোর বেলা খুব শান্ত। শিখা একটু হেসে বলল, 'সত্যি সেজন্যে কাল কি কষ্টেই না তোমার কেটেছে। খাওয়াও হয় নি, ঘুমও হয় নি। ও ঘর থেকে আমি দু দুবার এসেছিলাম। দেখি তুমি রাত জেগে বসে বসে হা-হুতাশ করছ।

অন্য কেউ হলে বলত তোমার নাক ডাকছে। কিন্তু আমি জানি ও তোমার বিরহের দীর্ঘশ্বাস।'

প্রদোষ প্রতিবাদ করে বলল, 'বাঃ রে আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগেছিলাম।'

শিখা তেমনি হেসে বলল, 'আমি কি তা অস্বীকার করছি? তোমার কাপে চিনি দেব আর একটু?'

কাপে আর একবার ঠোঁট ছুঁইয়ে প্রদোষ বলল, 'দাও।'

চায়ের পাট তখনো শেষ হয়নি, পদ্মা এসে বলল, 'দিদিমণি, আপনার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। তাঁকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে যাব?'

শিখা বলল, 'তা নয় তো কি তোর রান্নাঘরে নিবি? তাঁকে বল আমি আসছি।'

প্রদোষ টেবিল ছেড়ে ওঠবার আগেই শিখা উঠে পড়ল। প্রদোষ পিছন থেকে বলল, 'বোধ হয় কোন ক্যামেরাম্যান, না হয় কোন স্বাক্ষর-সন্ধানী। কলমটি নিয়ে যাও সঙ্গে।'

শিখা শোবার ঘরে গিয়ে ড্রেসিং-টেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কলম নেওয়ার জন্যে নয়। শাড়িটা পালটে নিল। চুলে চিরুনি আর মুখে আলতো করে পাউডারের পাফ বুলিয়ে নিল একটু, তারপরে ড্রয়িংরুমে ঢুকল। ছোট্ট ঘর। ফার্নিচারের প্রাচুর্য নেই। দুপাশে দুটি কম-দামী সোফা। মাঝখানে নিচু একটি গোলমতো টেবিল। তার ওপর চীনেমাটির ত্রিকোণী ছাইদানি। ছোট কাঁচের আলমারিতে ফিল্ম আর স্টেজ-ক্র্যাফট-সংক্রান্ত কিছু বই। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের বড় একখানা ফটো। আর কিছু ল্যাণ্ডস্কেপ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা ইজেলও দেয়ালে ঠেস দেওয়া রয়েছে। বেশ বোঝা যায় শিগগির তার কোন ব্যবহার হয় নি।

আগন্তুক সকালের কাগজখানায় চোখ বুলাচ্ছিলেন, শিখা ঘরে ঢুকতে মুখ তুলে তাকালেন।

সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে উঠল শিখা, 'আরে শ্রীমন্তদা, আপনি যে !'

বছর পঞ্চাশেক বয়স হয়েছে শ্রীমন্ত মজুমদারের। মোটাসোটা চেহারা। গায়ের রং বেশ ফর্সা। তিনটি আঙুলে দামী পাথর বসানো তিন রঙের তিনটি আংটি। দেখলেই বোঝা যায় বেশ ধনী সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। মুখে প্রসন্ন পরিতৃপ্তির ছাপ।

শুধু শ্রীমন্তবাবুই নন। তাঁর সঙ্গে আরো দুটি ছেলে এসেছেন। শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'হুঁ আমাকেই আসতে হল। শ্বেতহস্তী ছাড়া রানীর উপযুক্ত বাহন আর কে।'

শিখা লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি যা তা বলছেন। ব্যাপারটা কি তাই বলুন। আপনার মতো মানুষ নিশ্চয়ই কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া আসেন নি।'

শ্রীমন্ত বললেন, 'উদ্দেশ্যটা যে মহৎ তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের উজ্জীবন সংস্কৃতি পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন এই অক্টোবরে। এবার ফাংশনটা বেশ একটু বড় করে করব ঠিক করেছি। এক সপ্তাহ ধরে উৎসব চলবে। মার্গসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক সঙ্গীত, লোক-সঙ্গীত চারটি ধারারই আলোচনা আর ডিমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করেছি। এই সম্মেলন যাতে সত্যিকারের সম্মেলন হয় তাই আমাদের ইচ্ছা। আমরা প্রাচীন নবীন সব আর্টিস্টকে ডাকব। বাম দক্ষিণ সবাইকে আসতে অনুরোধ করব। আশা করছি সব দলের প্রতিনিধি এতে থাকবেন।'

শিখা বলল, 'খুব ভালো কথা।'

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'তোমাকেও আসতে হবে। তোমাদের নৃত্য-

নাট্যের অনুষ্ঠান হবে সবচেয়ে শেষে। একেবারে মধুরেণ—সমাপয়েৎ করবার ইচ্ছা। আর একটা সুখবর তোমাকে দিচ্ছি।'

শিখা বলল, 'কি খবর বলুন।'

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'নৃত্যশিল্পী শ্রীধর রাও এখন কলকাতায় আছেন। তাঁর কাছেও আমরা গিয়েছিলাম। তিনি রাজী আছেন।'

শিখা খুশী হয়ে বলল, 'সত্যি!'

ডান্সার হিসাবে মারাঠী শিল্পী শ্রীধর রাওয়ের খ্যাতি শুধু দেশে নয়, বিদেশেও ছড়িয়েছে। দলবল নিয়ে দু-দু বার তিনি ইউরোপ ঘুরে এসেছেন। প্রবীণ শিল্পীর কৃতিত্বকে সবাই স্বীকার করে, সবাই শ্রদ্ধা করে। তিনি নাচবেন শুধু এই সংবাদেই শিখা উল্লসিত হয়ে উঠল। এ যেন মৃদু বাতাসে দীপশিখার সুখশিহরণ।

শিখা বলল, 'ভালোই হল, এই উপলক্ষে তাঁর নাচ আমরা দেখতে পাব।'

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'তোমরা নাচবে। আমরা দেখব। সারা কলকাতা—কলকাতা কেন সারা বাংলার লোক দেখবে। আমরা পূর্ববঙ্গের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি। সেখান থেকেও শিল্পীরা আসবেন, সমঝদাররা আসবেন। হ্যাঁ শ্রীধর রাও রাজী হয়েছেন এক শর্তে। তাঁর পার্টনার অম্বিকা রাও অসুস্থ। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আছেন। তিনি ফাংশনে থাকতে পারবেন না। তা সত্ত্বেও শ্রীধর রাও নাচতে রাজী আছেন যদি ভালো পার্টনার পান। তাঁর দলের মধ্যে আর তেমন কোন মেয়ে আর্টিস্ট নেই।'

শিখা রুদ্ধশ্বাস হয়ে বলল, 'তা হলে উপায়?'

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'উপায় একমাত্র তুমি।'

শিখা অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমি! কি বলছেন শ্রীমন্তদা?'

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'ঠিকই বলছি। আমরা সবাই মিলে তোমার কথাই তাঁকে বলেছি। তিনি রাজী আছেন। তোমার প্রতিভার কথা তিনি শুনেছেন। তোমার ওপর বিশ্বাস আছে তাঁর।'

শিখা বলল, 'প্রতিভা! আপনি ঠাট্টা করেছেন শ্রীমন্তদা। তাঁর কাছে আমি দাঁড়াতে পারি? তা ছাড়া আমাদের ধারাও তো আলাদা। আমি সাধারণ ও ব্যালেতে নাচি। অবশ্য কথক, ভরতনাট্যম্, কথাকলি সব ধারারেই কিছু না কিছু চর্চা করতে হয়েছে। কালও আমার ছাত্রীদের কথক শেখাচ্ছিলাম।'

শ্রীমন্তবাবু হেসে বললেন, 'তুমি কি জান না-জান আমাদের জানা আছে। অত সংকোচ করবার কিছু নেই তোমার। শ্রীধর রাও শুধু ভরতনাট্যম্ কি শুধু কথক নিয়ে এখানে নাচবেন না। তিনি মিশ্র-ধরনের কিছু করতে চান। যা লোকরঞ্জক হবে অথচ সস্তা হবে না। কম্পোজিশন সম্বন্ধে তিনি তোমার সঙ্গে মিলেমিশে, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেই যা হয় করবেন। তিনিও নতুন একসপেরিমেণ্ট করবার জন্যই এবার এখানে এসেছেন। তাঁর কাছে কবে তুমি যেতে পারবে? কবে তোমায় সময় হবে বল?'

শিখা বলল, 'সময় আমার আজও হতে পারে। কিন্তু প্রদোষকে বলতে হবে একবার। প্রদোষ—মানে আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার বোধ হয় আলাপ আছে।'

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'বোধহয় বলছ কেন, নিশ্চয়ই আলাপ আছে। তিনি বোধহয় ব্যস্ত আছেন এখন।'

শিখা বলল, 'না না, ব্যস্ত আর এমন কি। আমি ডেকে আনছি তাঁকে। বসুন আপনারা।'

শোবার ঘরের ভিতরে গিয়ে শিখা দেখল প্রদোষ একটা চেয়ারে চুপ

করে বসে আছে, একটু বিরক্ত হয়ে শিখা বলল, 'তুমি এখানে বসে বসে কি করছ? বাইরে যেতে পারলে না?'

প্রদোষ বলল, 'ওখানে গিয়ে কি করব। ওঁরা তোমার কাছে এসেছেন, আমার কাছে তো আসেন নি।'

ভ্রূকুঞ্চিত করতে করতে হেসে ফেলল শিখা। 'আমার কাছে এলে বুঝি তোমার কাছে আসা হয় না। কি হিংসুটেই না হয়েছে তুমি আজকাল। যাও, ওঘরে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বল, আমি ততক্ষণ ওঁদের চা-টার ব্যবস্থা করি।'

শ্রীমন্ত মজুমদারের সঙ্গে প্রদোষের আলাপ আছে। নোনাপুকুরের জমিদার এই ধনী ভদ্রলোক শিল্প-সংস্কৃতি, নৃত্য-সঙ্গীতের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। শোনা যায় এঁর পূর্বপুরুষের বৈঠকখানায় বড় বড় ওস্তাদ গায়কের, বাগানবাড়িতে বিখ্যাত বাঈজীদের পদধূলি পড়ত। কিন্তু শ্রীমন্তবাবুর আমলে শিল্পানুরাগের ধরন বদলে গেছে। তিনি এক সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি। তাঁর পরিষদে পারিষদ নেই, কর্মীরা আছে। তিনি সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করেন। এমন বিনয়ী নিরহঙ্কার মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। যেখানে লোক কি চিঠি পাঠালে চলে সেখানেও নিজে যান তিনি আর্টিস্টদের বাড়িতে। অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যে নিজের মুখে তাদের অনুরোধ করেন। মহিলা আর্টিস্টদের সম্বন্ধে অল্পস্বল্প কিছু দুর্বলতা থাকলেও তিনি অশোভন কিছু করেছেন এমন অপবাদ কেউ তাঁকে দেয় নি। যারা মাঝারি ধরনের আর্টিস্ট তাদেরও বড় বড় ফাংশনে ডেকে উৎসাহ দিয়ে সুখ্যাতি করেন এবং ক্যারিয়ার ভালো করবার সব রকম সুযোগ-সুবিধে করে দিতে তাঁর কার্পণ্য নেই। তার বিনিময়ে তিনি তাদের সামনে বসিয়ে একটু বেশিক্ষণ ধরে কথা বলেন, কি বড় জোর নিজের গাড়িতে করে গন্তব্যস্থানে

পৌঁছে দিয়েই তিনি খুশী থাকেন। শিখাকে তিনি ছেলেবেলা থেকে জানেন। তাঁর অনেক অনুষ্ঠানে সে নেচেছে। যে নাচের স্কুলে শিখা এখন চাকরি করে, সপ্তাহে চারদিন ছাত্রীদের নাচ শেখায়, ভবানীপুরের সেই ভারতী কলা কেন্দ্রের গভর্নিং-বডির তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য।

প্রদোষ বাইরের ঘরে এসে শ্রীমন্তবাবুকে নমস্কার জানাল। হেসে বলল, 'ভালো তো সব ?'

শ্রীমন্তবাবু স্মিতমুখে বললেন, 'হ্যাঁ ভালো। আপনি ব্যস্ত আছেন ভেবে এতক্ষণ ডাকি নি। আমরা এসেছি অনেকক্ষণ।'

অন্য দুটি যুবকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন প্রদোষের। 'নির্মল চৌধুরী আর সুরঞ্জন রায়। আমাদের পরিষদের কর্মী। এদের মত sincere worker দুচার জন আছে বলেই পরিষদ এতদিন টিঁকে রয়েছে। নিজ নিজ লাইনে এরাও গুণী। সেতারে নির্মলের চমৎকার হাত। আর সুরঞ্জনেরও অনেক গুণ। ও আমাদের নবীন নাট্যকার। রেডিওতে ওর লেখা নাটক মাঝে মাঝে শুনে থাকবেন।'

প্রদোষ শোনে নি তবু হেসে বলল, 'শুনেছি বই কি।'

শ্রীমন্তবাবু প্রদোষেরও পরিচয় দিলেন, 'তরুণ আর্ট ডিরেক্টরদের মধ্যে ইনি একেবারে প্রথম সারির, বুঝলে সুরঞ্জন। আমি নিজের চোখে ওঁর কাজ দেখেছি। তুলনা হয় না, তুলনা হয় না। এবার আমাদের সম্মেলনের মণ্ডপ কিন্তু আপনাকেই সাজিয়ে দিতে হবে। উঁহু, না করলে শুনব না, বেশি সময় হাতে না থাকে, ছোকরাদের দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন অন্তত।'

তারপর সম্মেলনের ব্যাপক পরিকল্পনা, শ্রীধর রাওয়ের সঙ্গে শিখার নাচের ব্যবস্থার কথা সব শোনালেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন আর্টিস্টরা সবাই বিনা দক্ষিণায় কি নামমাত্র দক্ষিণায় রাজী হয়েছেন।

কারণ এটা শ্রীমন্তবাবুদের কোন লাভের ব্যবসা নয়। খরচ-খরচা বাদে যা থাকবে তার কিছুটা পরিষদের উন্নতির জন্যে রেখে বেশির ভাগ রাজ্যপালের যক্ষ্মাভাণ্ডারে দেওয়া হবে।

বড় একটা ট্রেতে করে চা আর স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এল শিখা। তারপর সেই গোল টিপয়টার ওপরে নামিয়ে রাখল।

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'দেখ তো, কেন এত কষ্ট করে এসব—তোমরা মেয়েরা শুধু নৃত্যশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী হয়ে খুশী হও না, সেই সঙ্গে একজন পাকা গৃহিণী না হতে পারলে তোমাদের স্বস্তি নেই। কিন্তু আমাদের এই নির্মল আর সুরঞ্জনকে দেখ! পারবে ওরা বাজার করতে কি অফিসে মন দিয়ে চাকরি-বাকরি করতে? ও হরি, তোমার সঙ্গে বুঝি ওদের পরিচয় করিয়ে দিই নি। আমার ধারণা ছিল তোমাদের আলাপ পরিচয় আছে।'

এই ফাঁকে শ্রীমন্তবাবু নির্মল আর সুরঞ্জনের গুণপনা সম্বন্ধে আরো কিছু অতিশয়োক্তি করে নিলেন। তারপর বললেন, 'তোমাদের নৃত্যনাট্যটা সুরঞ্জনকে দিয়ে লিখিয়ে নিও শিখা। এই সব তরুণ শিল্পীদের চান্স দেওয়া উচিত। আমার তো অন্তত তাই মত। ওরা ভুল করবে, কাঁচা কাজ করবে। তবু ওদেরই ছেড়ে দিতে হবে জায়গা। যদি ছেড়ে না দাও ওরা কেড়ে নেবে। কি বল হে সুরঞ্জন?'

সুরজন লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না কি যে বলেন, আমি কেন লিখব। আরও কত বড় বড় গুণী রয়েছেন—'

স্যাণ্ডউইচে কামড় দিয়ে শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'বাঃ চমৎকার হয়েছে। তোমার নিজের হাতের তৈরী, না শিখা? আমি খেয়েই বুঝতে পেরেছি। ঠিক এই রকম খাবার তৈরির বাতিক আছে আমাদের রঙ্গনা গাঙ্গুলীর। চেন তো রঙ্গনাকে।'

শিখার মুখখানা একটু যেন ফ্যাকাসে দেখাল। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল, 'বাঃ চিনব না কেন? আমরা একই সঙ্গে পড়েছি, একই ইন্‌স্টিটিউশনে নাচ-গান শিখেছি। তারপর ফাংশনে ও গেয়েছে আমি নেচেছি। তার কোন কোন ফাংশনে তো আপনিও উপস্থিত ছিলেন শ্রীমন্তদা। বোধ হয় খেয়াল নেই আপনার।'

কৌশলে শ্রীমন্তবাবুকে উল্টো খোঁচা দিল শিখা।

শ্রীমন্তবাবু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আলাপ-আলোচনাটাকে সহজ খাতে বইয়ে দেওয়ার জন্যে প্রদোষ বলল, 'হ্যাঁ রঙ্গনার সঙ্গে আমাদের বেশ আলাপ আছে, তাছাড়া সে তো শিখার বন্ধুও।'

শ্রীমন্তবাবু এবার একটু অর্থ-ব্যঞ্জকভাবে হাসলেন, 'ঠিক ঠিক। আমি ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিছু মনে কোরো না শিখা। হ্যাঁ, রঙ্গনার কথা হচ্ছিল। লাইট মিউজিকে আজকাল ওর বেশ নাম হয়েছে। রেকর্ড থেকে ভালো রোজগার হয়। রেডিওতে বেশ আধিপত্য আছে। জলসা-টলসাতেও ওর খুব চাহিদা। কিন্তু যত বড় আর্টিস্টই হোক, রান্নাবান্না ঘর-কন্নার কাজ পেলে আর কিছু চায় না। বিশেষ করে খাবার-টাবার তৈরি করতে খুবই ভালবাসে। গতবার শীতে খুব পিঠে-টিঠে তৈরি করে খাওয়ালে। আমি বললাম, রঙ্গনা তোমার গলার চেয়ে যেন হাতই আজকাল বেশি মিঠে লাগছে। রঙ্গনা তার উত্তরে বলেছিল কি জান? এ তো খুব ভরসার কথা নয় শ্রীমন্তদা। গান-টান বন্ধ করে শেষে কি মিষ্টির দোকান খুলব?'

শিখা জিজ্ঞাসা করল, 'রঙ্গনাও আসছে তো কনফারেন্সে?'

শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই। ওকে তো ডাকতেই হবে। নইলে কি অডিয়েন্স রক্ষা রাখবে আমাদের?'

সকলের সম্বন্ধেই শ্রীমন্তবাবুর একটু বাড়িয়ে বলা অভ্যাস। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না রঞ্জনার গান আজকাল বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। এতদিন শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতে খ্যাতি ছিল রঞ্জনার। আজকাল প্রাচীন বাংলা গান আর ভজনেরও রেকর্ড করাচ্ছে। রঞ্জনার জনপ্রিয়তার কথা মনে হওয়ায় একটু যেন ঈর্ষা বোধ করল শিখা। সেই সঙ্গে একথাও মনে হল যে সব জেনে-শুনেও শ্রীমন্তদা প্রদোষ আর শিখাকে খোঁচা দেওয়ার জন্যেই, একটু কৌতুক করবার জন্যেই রঞ্জনার প্রসঙ্গটা এ বাড়িতে তুললেন। সঙ্গীত-প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে আর্টিস্টদের ব্যক্তিগত জীবনের অন্দর-মহলে উঁকি-ঝুঁকি মারবার প্রবৃত্তিও আছে শ্রীমন্তদার।

শিখার মনটা একটু অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

শ্রীমন্তবাবু সে কথা বুঝতে পেরে বললেন, 'যদি তোমার কোন অসুবিধে না থাকে আমি তো বলি তুমি এখনই চল শিখা। শ্রীধর রাওয়ের সঙ্গে তোমার কথা-বার্তাটা ঠিক হয়ে যাক। সময় তো বেশি নেই। মাঝখানে মাত্র দিন পনেব বাকি। আমাদের তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে হবে।'

শিখা একবার ভাবল বলে আজ দরকার নেই। পরেই এক সময় যাবে। কিন্তু নিজের স্বার্থের কথা ভেবে মনে যেটুকু বিদ্বেষ জন্মেছিল তা চেপে রেখে বলল, 'আচ্ছা চলুন তাহলে। আপনি বসুন শ্রীমন্তদা। আমার তৈরি হয়ে নিতে মিনিট দশের বেশি লাগবে না।'

শ্রীমন্তবাবু কৌতুকের ভঙ্গিতে বললেন, 'যদি আরো দুচার মিনিট বেশি লাগে সংকোচ কোরো না। সাজ-সজ্জার ব্যাপারে দেরিটা তোমরা পুষিয়ে দিতে পার।'

কচি কলাপাতা রঙের শান্তিপুরী শাড়ি পরে ড্রেসিং-টেবিলের

সামনে দাঁড়িয়ে শিখা চোখে সুর্মা পরছিল, প্রদোষ এসে পিছনে দাঁড়াল, 'তুমি কি এখনই বেরুচ্ছ?'

শিখা বলল, 'হ্যাঁ। শ্রীমন্তদার কাছে সব তো শুনলে। আমি যাব আর আসব। আপত্তি কোরো না লক্ষ্মীটি। বিকেলে তো আবার আমাকে ক্লাস নিতে হবে।'

প্রদোষ বলল, 'শরীরের এই অবস্থায় তুমি কি কোন প্রোগ্রাম করতে পারবে? করা উচিত হবে তোমার?'

শিখা হেসে বলল, 'শরীরটা তো আমার। কোন অবস্থায় কি করা উচিত তা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তা ছাড়া আজই তো কিছু হচ্ছে না। আজ শুধু আলাপ-আলোচনাই হবে। জানো, এমন চান্স জীবনে খুব কম আসে।'

প্রদোষ অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'বেশ, তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।'

শিখা মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'আমার ইচ্ছা কি তোমার ইচ্ছা নয়?'

চোখ ফিরিয়ে নিল প্রদোষ। শিখার হাসবার আর কথা বলবার যে ভঙ্গি তাকে এক সময় মুগ্ধ করেছিল, আজকাল তা অভিনয়ের মতো লাগে। তাতে যেন আন্তরিকতা নেই; কাজ উদ্ধার করবার জন্য অন্য জায়গায় যে সব কৌশল শিখা প্রয়োগ করে প্রদোষের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় না। এও কি শিল্পীর ক্যারিয়ার গড়বার পক্ষে অপরিহার্য? না কি এই ছলাকলা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে শিখার? নিজের অভিনয় সম্বন্ধে সে নিজেই সচেতন নয়।

ঘরের কাজকর্ম সম্বন্ধে পদ্মাকে কিছু নির্দেশ উপদেশ দিয়ে বিচ্ছুকে একটু গাল টিপে আদর করে শিখা বেরিয়ে পড়ল।

একটু বাদে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। শ্রীমন্তবাবু আবার যেন কি একটা রসিকতায় হেসে উঠলেন।

প্রদোষের মনে হল এ রসিকতাটা নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে।

বেলা নটা বাজল, সাড়ে নটা। তবু শিখা তার কাজ সেরে ফিরে এল না। প্রদোষ ঘরের এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। এ বই রেখে ও বই খুলল। একবার ভাবল নতুন কোন একটা ছবি আঁকতে বসে যায়। কিন্তু মন বসল না। আজকাল ছবি আঁকবার কথা ভাবলে গায়ে জ্বর আসে। বহুদিন নিজের ইজেলের কাছে বসে না প্রদোষ। নিজের ধারণা ভাবনার কোন চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলে না। পরের সেট তৈরির কাজ ছাড়া তার তো নিজের আর কোন কাজ নেই আজকাল। সে আর এখন শিল্পী নয়, শিল্প-ব্যবসায়ী। দু-তিন বছরের মধ্যে কোন ছবি সে একজিবিশনে পাঠায় নি, কি কোন কাগজে ছাপতে দেয় নি। শুধু সেট তৈরি করেছে। সেট আর সেট। সবই শিখার জন্যে। শিখার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে, তার ক্যারিয়ারের উন্নতির জন্যে, প্রদোষ শুধু যে প্রাণপাত করছে তাই নয়, প্রাণের চেয়েও যা তার কাছে প্রিয় ছিল সেই শিল্পকে সে উৎসর্গ করেছে।

লোকে যে তাকে স্ত্রৈণ বলে আড়ালে পরিহাস করে তা করবার অধিকার তাদের আছে বই কি।

পদ্মা এসে বার দুই তাড়া দিয়ে গেল, 'দাদাবাবু বেলা হয়ে গেল যে। নাবেন খাবেন না।'

প্রদোষ বিরক্ত হয়ে বলল, 'না না। আমার এখন অনেক দেরি আছে। তুই যা এখান থেকে।'

পদ্মা ধমক খেয়েও নড়ল না, দাঁড়িয়ে রইল। তারপর প্রদোষ যখন ফের তার দিকে তাকাল পদ্মা আস্তে আস্তে বলল, 'দাদাবাবু।'

'কিরে!'

পদ্মা বলল, 'আপনি যেন কি রকমই আজকাল হয়ে যাচ্ছেন।'

প্রদোষ কৌতুক বোধ করে হাসল, 'কি রকম হয়ে যাচ্ছি ?'

পদ্মা বলল, 'আগে আপনি তুই বলতেন না ; আজকাল একটু রেগে গেলেই তুই বলেন। দিদিমণির মুখে মানায় কিন্তু আপনার মুখে মানায় না দাদাবাবু।'

হো হো করে হেসে উঠল প্রদোষ, 'তাই তো। তুমি তো আজকাল ভদ্রমহিলা হয়ে পড়েছ পদ্মা। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আর এমন ভুল হবে না, কখনো হবে না। যদি হয়, তুমি আমার নামে মানহানির মামলা এনো!'

পদ্মা চলে যাচ্ছিল, হাসি থামিয়ে প্রদোষ তাকে ফের ডাকল, বলল, 'বিচ্ছু কোথায়।'

পদ্মা বলল, 'তাকে নাইয়ে খাইয়ে পাঁচ নম্বরের গোবিন্দের সঙ্গে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

কাছেই কিণ্ডারগার্টেন আছে একটা। পাঁচ নম্বরের ফ্লাটের হরপ্রসাদ বাবুর মেয়ে যায় সেই স্কুলে। তাদের চাকর গোবিন্দ পেঁৗছে দিয়ে আসে। পদ্মা বুদ্ধি করে সেই সঙ্গে বিচ্ছুকেও পাঠিয়ে দিয়েছে। নইলে প্রদোষকেই যেতে হত।

প্রদোষ খুশী হয়ে বলল, 'তোমার বুদ্ধি আছে পদ্মা। কোন ব্যবস্থায় তোমার ত্রুটি হয় না। যাকে বলে জাত গৃহিণী, তুমি তাই। অতি ঘরন্তী না পায় ঘর। এ প্রবাদ কিন্তু আমি মানব না। পছন্দমতো ছেলে পেলেই আমি ফের তোমার বিয়ে দেব।'

পদ্মা জিভ কেটে বলল, 'দাদাবাবু, ওইসব অকথা-কুকথা যদি ফের বলেন আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব। হিন্দুর মেয়ের কবার বিয়ে হয় ?'

প্রদোষ হেসে বলল, 'অবস্থা বিশেষে আজকাল অনেক বার হতে

পারে। হিন্দু কোড বিল পাশ হয়ে গেছে যে। আচ্ছা বিলের ধারা-গুলি আমি তোমাকে একদিন বুঝিয়ে দেব।'

'দরকার নেই আমার বুঝে।' বলে রাগ করে সেখান থেকে চলে গেল পদ্মা। প্রদোষ স্মিতমুখ তাকিয়ে রইল একটুকাল পদ্মার চলে যাওয়ার ভঙ্গির দিকে। মনে মনে ভাবল, পদ্মার মতো মেয়েদের কুসংস্কার কাটতে যথেষ্ট সময় লাগবে। কিন্তু শুধু পদ্মারাই বা কেন, শিক্ষিত ভদ্র ঘরের মেয়েদের সংস্কারই কি সহজে কাটবে? আইন হিসাবে পাশ হয়ে গেলেও সামাজিক সম্মতি পেতে দেরি হবে। স্বামী নষ্ট, মৃত, কিংবা সন্ন্যাসী হয়ে বেঁচে থাকলে ভদ্রঘরের হিন্দু মেয়ে সহজে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে চাইবে না। তবু এই নতুন বিধি অনেক ভালো। যারা বিচ্ছেদ চায় তাদের জন্য বিয়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলবার ব্যবস্থা রাখা ঢের সুবিবেচনার কাজ।

একটু চমকে উঠল প্রদোষ। ছি ছি ছি, এসব কি সে ভাবছে। শিখার ফিরতে যত বেশি দেরি হবে প্রদোষের মেজাজ তত খারাপ হতে থাকবে। তার চেয়ে নাওয়া-খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়া ঢের ভালো। তা হলে আর শিখার জন্যে অপেক্ষা করার কথা উঠবে না।

আর একটুও দেরি না করে চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে উঠে পড়ল প্রদোষ। থাকুক শিখা একা বাড়িতে। যত তাড়াতাড়ি পারে প্রদোষ বেরিয়ে পড়বে। তাহলে আর রাগে-বিদ্বেষে-বিরক্তিতে ধৈর্য হারাতে হবে না প্রদোষকে।

স্নানাহার শেষ করে এগারোটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ল প্রদোষ। শিখা তখনও ফেরে নি। যখন খুশি তখন ফিরুক, যেদিন খুশি সেদিন ফিরুক শিখা। তার জন্যে প্রদোষের কোন কিছু আটকে থাকবে না।

প্রতি দিনের অভ্যাস অনুযায়ী রাসবিহারী এভিনিউর মোড় থেকে

টালীগঞ্জের বাসে উঠে বসল প্রদোষ। তারপর খানিকটা পথ হেঁটে স্টুডিওর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। পুরোন হিন্দুস্থানী দারোয়ান রাম ভজন বসে বসে খইনি টিপছিল। প্রদোষকে দেখে একটু হেসে সেলাম জানাল। তার হাসির অর্থ, আজ তো কাজকর্ম নেই। বাবু বোধহয় টাকার গরজে এসেছে। কিন্তু টাকা কি আর এখন মিলবে।

সত্যিই বড় সকাল সকাল এসে পড়েছে প্রদোষ। কোন ফ্লোরেই এখন কাজ হচ্ছে না। চাকর বেয়ারা দুচারজন ছাড়া কোন টেকনি-সিয়ান কি কোন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর দৈনিক হাজিরা দেওয়ার জন্যেও এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছান নি। আগের ছবিটার জন্যে যে রাজসভা তৈরি করেছিল প্রদোষ, তার ভাঙাচোরা কাঠগুলি কুলীরা বাইরের দিকের একটা ঘরে জড়ো করে রেখেছে।

জনবিরল কিন্তু বৃক্ষবহুল স্টুডিওর উঠান পার হয়ে দোতলায় উঠে গেল। স্টুডিওর অফিস। সারি সারি কামরা। প্রদোষকে দেখে বেয়ারা নীলরতন একটা ঘর খুলে দিল। টেবিলটা পরিষ্কার করতে শুরু করল ঝাড়ুনি দিয়ে। বলল, 'কিছু লাগবে প্রদোষবাবু ?'

প্রদোষ বলল, 'এক গ্লাস জল।'

বড় একটা পরিচ্ছন্ন কাঁচের গ্লাসে জল নিয়ে এল নীলরতন। রাখল টেবিলের ওপর।

'প্রদোষবাবু!'

'কি রে।'

'আমাদের নতুন বই কবে আরম্ভ হবে ?'

প্রদোষ হেসে বলল, 'শিগগিরই আরম্ভ হবে। ডিরেক্টরকে বলব এবার তোকে দু-এক নম্বর পার্ট দিতে, কি বলিস !'

বছর পনের-ষোল বয়স হয়েছে নীলরতনের। কচি গোঁফের রেখা

দেখা দিয়েছে ঠোঁটের ওপর। মেদিনীপুরে বাড়ি। গায়ের রং খুব কালো। মুখশ্রীটুকু ভারি সুন্দর। পাথরে কোঁদা বিষ্ণু মূর্তির মতো। প্রদোষ অনেকদিন ভেবেছে ওর একটা বাস্ট আঁকবে। হয়ে ওঠে নি। জীবনে অনেক ভাবনাই রূপ পায় না, রঙ পায় না। তা নিয়ে বেশি দুঃখ করে লাভ নেই। প্রদোষ মনে মনে ভাবল। তুলির রঙে কি পেনসিলের রেখায় পৃথিবীর কতটুকু রূপ তুমি ধরতে পার। তোমার কতটুকু সাধ্য? আঁকাটা বড় কথা নয়, তার চেয়েও বড় কথা দেখা। চোখ দিয়ে দেখার সঙ্গে হৃদয় দিয়ে দেখা। এ দৃষ্টি সৃষ্টির সমান, এ দৃষ্টিতে সৃষ্টির আনন্দ। প্রদোষ মনে মনে ভাবল। ওকে পার্ট দেওয়া হবে এই কথা শোনবার পর কি খুশীই না হয়েছে নীলরতন। ওর আনন্দিত মুখ, সুগঠিত সুন্দর শুভ্র দাঁতগুলি ফের প্রদোষের রূপানুভূতির উদ্রেক করেছে। প্রদোষ বোধ হয় পারবে আবার ছবি আঁকতে, পারবে।

নীলরতন আবার জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যিই বলবেন তো বাবু?'

প্রদোষ বলল, 'নিশ্চয়ই বলব। আর মিনিট পনের বাদে ফের একবার আসবি।'

নীলরতন বলল, 'পান-সিগারেট কিছু আনতে দেবেন বাবু?'

প্রদোষ বলল, 'না না, কিছু আনতে দেব না। তুই শুধু এমনিই একবার আসিস।' প্রদোষ নিজের মনে গুন গুন করতে লাগল।

নীলরতন কি বুঝল কে জানে। লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল ঘর থেকে। তার সেই পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে নিজের মনেই একটু হাসল প্রদোষ। ও বোধ হয় ভেবেছে বাবু পাগল হয়ে গেছে। পাগলই তো, রূপোন্মাদ। শিল্পীর কাছে জাত নেই, পদ নেই, দোষ নেই, গুণ নেই, শুধু রূপ আছে। রূপময়ী পৃথিবী আর রূপময়ী নারী।

প্রদোষ মনে মনে বলল 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি। অরূপ রতন এখনো চিনি নি, এখনো বুঝি নি। তার জন্যে এখনো আকাঙ্ক্ষা জাগে নি মনে, এখন শুধু রূপ, শুধু রূপ-রতন।'

দামী বিলাতী পকেট ডায়েরিটা বার করল প্রদোষ। বন্ধুবান্ধবের ঠিকানা, এনগেজমেণ্টের তারিখ—আর সময়; টাকা-পয়সার টুকিটাকি হিসেব। তারপর কয়েকটা সাদা পাতা। ঠিক সাদা নয় নীলচে। তার একটি পাতায় বিদেশী কলমের সূক্ষ্ম ডগা দিয়ে নীলরতনের মুখ আঁকতে লাগল প্রদোষ! তিন-চার মিনিটে এঁকে ফেলল তার সেই কোঁকড়ানো চুল, যুগল ভুরু, গোঁফের রেখা, দাঁতের সারি, কোমল চিবুক। সামনের পাতায় এঁকে তুলল আর একটি কিশোরীকে। ঈষৎ লম্বাটে ধরনের মুখ, তার যুগ্ম ভ্রূ, আয়ত চোখ, পাতলা ঠোঁট, আঁচলের তলায় স্ফুটনোন্মুখ দুটি বুক।

এই যুগল মূর্তিকে পাশাপাশি রেখে একটু হাসল প্রদোষ। তারপর জোর গলায় ডাকল, 'নীলরতন, নীলরতন!'

পাশের ঘরেই ছিল নীলরতন। ছুটতে ছুটতে এল, 'ডাকছেন প্রদোষবাবু?'

প্রদোষ বলল, 'হ্যাঁ ডেকেছি, দেখ এসে।' ডায়েরির পাতা দুটি ছিঁড়ে নীলরতনের হাতে দিল।

'তোর ছবি আর তুই যাকে ভালবাসিস, মানে বড় হয়ে ভালবাসবি, তার ছবি। কেমন পছন্দ হয়? বিয়ে করবি একে?'

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবু। কি যে যা-তা বলছেন।'

নারী-প্রতিকৃতি-আঁকা পাতাটা টেবিলের ওপর রেখে লজ্জিতভাবে নিজের ছবিটা নিয়ে পালিয়ে গেল নীলরতন।

ডায়েরির পাতায় একটি মেয়ের মুখের আদলের দিকে তাকিয়ে হাসতে

লাগল প্রদোষ। কিন্তু একটু বাদেই তার ঠোঁটের সেই হাসি শুকিয়ে গেল। মনের খেয়ালে এ কার মুখ এঁকেছে সে? এ যে একটি চেনা মেয়ের মুখ, প্রথম চেনা মেয়ের মুখ। এ যে রঞ্জনা। 'বিজন ঘরে নিশীথ রাতে'র যে গানটি প্রদোষ একটু আগে গুনগুন করে গাইছিল তা যে রঞ্জনার মুখের গান, রঞ্জনাকে প্রথম শেখানো গান। সেই সুরের ধারায় ভেসে এসেছে অতীতের রঙ, তার কৈশোরের, প্রথম যৌবনের রঙ, প্রথম জীবনের প্রেম, প্রথম প্রেমের রঞ্জনা। আজই সকালে শ্রীমন্তবাবুর মুখে এই নামটি সে উচ্চারিত হতে শুনেছে। সেই নাম গোপনে গোপনে এতক্ষণ ধরে ধ্বনিত হয়েছে হৃদিকন্দরে। প্রদোষ টের পায় নি, টের পেতে চায় নি। তারপর সেই নামের ধ্বনি সুর হয়ে, রূপ হয়ে গুহামুখ ছেড়ে ছুটে বেরিয়েছে। সে আর এখন ক্ষীণ শীর্ণ নদী নয়। সেই ধ্বনি এখন বন্যা। তার একূল ওকূল চেনা যাচ্ছে না। অতীত বর্তমান—একাল সেকাল একাকার হয়ে যাচ্ছে।

রেল লাইনের ধারে ছোট মহকুমা শহরটি চোখ বুজলে এখনো স্পষ্ট দেখতে পায় প্রদোষ। এখনো যেন স্পষ্ট চোখে পড়ে ব্যারাকপুরের প্রথম মুন্সেফ নীরদ গাঙ্গুলীর বাসা। পিছনে নারকেলের বাগান। আর সামনে দু-জোড়া সুপারি গাছ খাড়া হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই গাছগুলি আপনা থেকে জন্মায় নি। সৌখীন বাড়িওয়ালা নিজে যত্ন করে বাড়ির এই স্থায়ী তোরণ তৈরি করেছিলেন। এই সবুজ সুপারি কুঞ্জে সাদা ধবধবে সুন্দর একটি দোতলা বাড়ি। এই বাড়িটি যে প্রদোষের প্রথম শিল্প-প্রেরণার মূল এ কথা কি সে অস্বীকার করতে পারে? পারে না, করেও না। হরমোহন একাডেমির হেডমাস্টার প্রফুল্ল বোসের বাড়ি যে ঐ রাস্তারই উল্টো দিকে সেও যেন এক ভাগ্যের

চক্রান্ত। ঠিক সামনাসামনি নয়, একটু দক্ষিণে সরে ছিল প্রদোষদের বাড়ি। কিন্তু তাদের বাইরের ঘর থেকে, প্রদোষের পড়বার ঘর থেকে ও বাড়ির সব দেখা যেত। দেখবার জন্যে প্রদোষ চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে একটু উত্তর-মুখী হয়ে বসে থাকত। পিঠের ওপর ঘন কালো চুল এলিয়ে দিয়ে যে মেয়েটি প্রায়ই এঘরে ওঘরে ব্যস্তভাবে যাতায়াত করত তার বয়স বছর চৌদ্দর বেশি নয়। যদিও গড়ন একটু বাড়ন্ত।

অল্পদিন আগে সে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। গায়ের রঙ ঠিক কালো বলা যায় না, উজ্জ্বল শ্যাম। চোখ মুখের গড়ন অপূর্ব সুন্দর। বাড়িতে তার ডাক নাম আংটি, আর স্কুলের নাম স্নিগ্ধা। মেয়েটি শহরের হাইস্কুলে থার্ডক্লাসে পড়ে। আর ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্র প্রদোষ। সামনে পরীক্ষা আর পিছনে হেডমাস্টার বাপ। কিন্তু হলে কি হবে। পাঠ্য বইয়ের তলায় প্রদোষ লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে যত অ-পাঠ্য নভেল আর গল্পের বই। আর আশ্চর্য, প্রত্যেক উপন্যাসের নায়িকার সঙ্গে মিলে যায় একটি মেয়ের মুখ, একটি মেয়ের তাকাবার ভঙ্গি, হাসবার ভঙ্গি। মুন্সেফ-নন্দিনী শুধু দুর্গেশনন্দিনী নয়, সে কপালকুণ্ডলা, বিনোদিনী, কিরণময়ী সব, সব। কিন্তু ওই সব অসামান্যা নারীরা গান গাইতে জানতেন কিনা সে কথা জানা যায় না। নীরদবাবুর মেয়ে আংটি কিন্তু সঞ্চয়িতা থেকে চমৎকার আবৃত্তি করে আর গীতবিতান থেকে অতি চমৎকার গান গায়। নীরদবাবুর বাড়িটি রবীন্দ্রসঙ্গীত আর সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্র। নীরদবাবু এই শহরে চাকরি নিয়ে আসতে না আসতে সুগায়িকা হিসাবে আংটির নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এতদিন আবৃত্তি আর গানে প্রদোষেরও খ্যাতি ছিল পাড়ায়। কিন্তু আংটির যশ সব ঢেকে দিল। প্রদোষের দিদি উমা ঠাট্টা করে বলল, 'তুই, আর পাত্তা পেলি নে।'

কিন্তু প্রদোষের সেজন্যে কোন আফসোস দেখা গেল না। আংটির সঙ্গে তার আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি। সে তো ছেলে নয়, সে যে মেয়ে। সে মেয়েও আবার যে সে মেয়ে নয়। তার পঠিত ইংরেজী বাংলা সবগুলি উপন্যাসের আর অলিখিত কিন্তু সুপরিকল্পিত প্রথম উপন্যাসের নায়িকা। আর্ট-স্কুলে ভর্তি হবার আগে সে একজন লেখক হবে এই আশাই ছিল প্রদোষের। কারণ তখন থেকেই সে গোপনে গোপনে লেখে। আর যেখানে মনে হয় ভাষাটা জুতসই হচ্ছে না সেখানে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেয়।

তারপর এক পঁচিশে বৈশাখ নীরদবাবু রবীন্দ্র-জয়ন্তীর আয়োজন করলেন। শহরের গণ্যমান্য ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা এসে সমবেত হলেন সেই সুপারিকুঞ্জে। বক্তৃতা হল, গান হল। আবৃত্তিতে বি-গ্রুপে প্রদোষ প্রথম পুরস্কার পেল। আর গানে সব গ্রুপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পেল আংটি। প্রদোষের বাবা খুশী হয়ে তাকে একটি রূপার মেডেল পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করলেন। প্রদোষ মনে মনে ভাবল 'বাবা না দিলে আমি দিতাম।'

তারপর মুন্সেফ আর হেডমাস্টারে বন্ধুত্ব হল। শুধু সাহিত্য, রাজনীতি আর সমাজনীতির আলোচনায় নয়, দাবা, পাশা, মাছধরায়ও তাঁরা সঙ্গী হলেন পরস্পরের। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, আসা-যাওয়া, মেলা-মেশা দুইটি পরিবারের মধ্যে অবাধে চলতে লাগল।

প্রদোষের মা আর দিদি আংটিকে ডেকে গান শোনেন। প্রদোষ পড়বার ঘরে কান পেতে থাকে।

তারপর আংটি একদিন গাইতে গাইতে হেসে বলল, 'আমি আর গাইতে পারব না মাসীমা।'

মন্দাকিনী অবাক হয়ে বললেন, 'কেন ?'

আংটি বলল, 'ও ঘরে কে যেন ভুল তাল দিচ্ছে। ইচ্ছা করে আমাকে বেতাল করে দেওয়ার মতলব।'

মন্দাকিনী হেসে উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে ছেলেকে ডেকে নিয়ে এলেন, 'আয় আলাপ করিয়ে দিই।'

নতুন করে আর কি আলাপ করাবেন মা! দুজনেই দুজনের নাম জানে, গুণপনার কথা জানে। শুধু মুখের কথাই এতদিন বাকি ছিল। ইচ্ছা করেই তারা তা বলে নি। কে আগে নত হবে? কে আগে গরজ দেখাবে? কার অত মাথা ব্যথা?

আলাপের শুরুতেই প্রথম অভিযোগ করল আংটি। বলল, 'আপনি ভুল তাল দিচ্ছিলেন।'

মন্দাকিনী হেসে বললেন, 'থাক থাক তোমাকে আর অত ভদ্রতা করে কথা বলতে হবে না। স্কুলের ছেলে মেয়ে তোমরা। তোমাদের মুখে আপনি আপনি শুনলে হাসি পায়।'

উমা প্রদোষের চেয়ে চার বছরের বড়। বিয়ে হওয়ার পর সে একেবারে পুরোপুরি মহিলা হয়ে উঠেছে। মার কথায় সায় দিয়ে উমা বলল, 'এ হল হাফপ্যাণ্ট আর ফ্রকের মধ্যে সৌজন্য বিনিময়। আংটি তুমি আমার মার কথা শুনো না। লোকে মন্দ বলবে তোমাকে। তুমি আমাদের খোকনকে বলবে প্রদোষবাবু। আর খোকন, তুমি আংটিকে স্নিগ্ধা দেবী বলে ডাকবে।'

প্রদোষ বলল, 'ঈস, আমার ভারি দায় পড়েছে। সারা শহর টিয়ে পাখির মত আংটি আংটি করছে আর ওই দাঁতভাঙা নাম বুঝি কেবল আমার বেলায়?'

উমা হেসে বলল, 'হতভাগা কোথাকার, আস্ত আস্ত আখ ভেঙে খাও

তাতে তোমার দাঁত ভাঙে না। দাঁত ভাঙবে বুঝি ওই স্নিগ্ধা নামটি বলবার বেলায়? তোর দাঁত কি বুড়োমানুষের মতো নড়বড়ে, না বাঁধানো দাঁত?'

প্রদোষ গম্ভীরভাবে বলল, 'সোনা দিয়ে বাঁধানো।'

আংটিও হেসে ফেলল। দেখা গেল তার দাঁতগুলি সোনার নয়, মুক্তার।

আংটি হেসে বলল, 'দরকার নেই তা হলে অমন ঠুনকো দাঁতের রিস্ক নিয়ে। খোকনদা যেন আমাকে আংটি বলেই ডাকে।'

প্রদোষের মা আর দিদি তার গুণপনাটাও আংটিকে দেখালেন। তার পাণ্ডুলিপিগুলি খুঁজে পেলেন না। সেগুলি প্রদোষ আগেই সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এ-ঘরে ও-ঘরে দেয়ালে দেয়ালে কালিতে তুলিতে রঙীন পেনশিলে কখনো বা চক খড়িতে আঁকা ছবি টাঙিয়ে টাঙিয়ে বাড়িটাকে প্রায় আর্ট গ্যালারি করে রেখেছিল প্রদোষ। তা আর লুকাতে পারল না। নদী, পর্বত, স্কুলবাড়ি, রেল স্টেশন—পৃথিবীর এমন কিছু নেই যা প্রদোষের হাতে না ধরা পড়েছে। আংটি দেখতে দেখতে চলল। তারপর এক জায়গায় এসে হেসে ফেলল আংটি। তার বাবা নীরদকান্তি আর প্রদোষের বাবা প্রফুল্লকুমার বসে বসে দাবা খেলছেন তার একটি ব্যঙ্গচিত্র। বিষম ভাবনায় একজনের মুখ ছুঁচলো আর একজনের মুখ চ্যাপ্‌টা। আংটি মুখে আঁচল চাপা দিল। তারপর বলল, 'এটা নিয়ে যাই, বাবাকে দেখাব।'

প্রদোষ অনেক আপত্তি করল, বাধা দিল, কিন্তু আংটি ছবিটা না নিয়ে ছাড়ল না।

পরদিন আংটির বাবা ডেকে পাঠালেন তাকে। প্রদোষ তো ভয়ে ভয়ে গিয়ে হাজির। কিন্তু নীরদবাবু খুশী হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলেন। দামী ছবির অ্যালবাম উপহার দিলেন তাকে।

ম্যাট্রিকুলেশনে ফল বেশি ভালো হল না। সেকেণ্ড ডিভিশন হল। তখনই আর্ট স্কুলে ভরতি করে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন প্রফুল্লবাবুর বন্ধুরা। কিন্তু তিনি জোর করে ভরতি করে দিলেন আই এস-সিতে। বললেন, 'কি হবে ছবি আঁকা শিখে। ওতে পেটের ভাত যোগাড় হবে না।'

আই এস-সিতে থার্ড ডিভিশনে পাশ করল প্রদোষ। আংটি এসে বলল, 'তুমি আর্ট স্কুলে এবার ভরতি হয়ে যাও, আর সময় নষ্ট কোর না।'

প্রদোষ বলল, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। এখন তোমার মুখেও এই কথা শুনলাম। ভারি ভালো লাগল শুনে। আমি কি করব না করব, সে কথা তুমিও ভাবতে শুরু করেছ।'

আংটি লজ্জিত হয়ে বলল, 'বাঃ রে আমি কেন ভাবব। বাবা মা বলছিলেন ও কথা। বলছিলেন খোকন অত ভালো ছবি আঁকে। অথচ প্রফুল্লবাবু ওকে সে লাইনে যেতে দিচ্ছেন না? আচ্ছা আমি বলব মেসোমশাইকে।'

প্রদোষ হেসে বলল, 'পারবে বলতে? আমার হয়ে বাবার কাছে সুপারিশ করতে লজ্জা করবে না তোমার?'

আংটিও হাসল, বলল, 'আমার অত লজ্জাটজ্জা নেই। আমার বাবার কাছে যেতে তুমি কত ভয় পাও। কিন্তু তোমার বাবার কাছে আমি কত সহজে আসি।'

সকলের অনুরোধে, পরামর্শে এবং ছেলের মনের ভাব বুঝে প্রদোষের বাবা তাকে শেষ পর্যন্ত আর্ট স্কুলে ভরতি হতে সম্মতি দিলেন। ব্যারাকপুর থেকে রোজ আসা-যাওয়ায় কষ্ট। তাই মাঝারি ধরনের একটা হোস্টেলও ঠিক করে দিলেন ছেলেকে। ম্যাট্রিক পাশ করে

আংটিও চলে এল কলকাতায়। ভরতি হল আশুতোষ কলেজে। রইল মামার বাসায় চেতলায়। পছন্দমতো পাত্র পেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন এ ইচ্ছাও শ্যালককে জানিয়ে রাখলেন নীরদবাবু।

কলেজ ছুটির পর প্রায় রোজ প্রদোষ গিয়ে দেখা করত আংটির সঙ্গে। চেতলায় ওর মামার বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসত। পথে কোথাও হয়তো কোন রেস্টুরেণ্টে ঢুকে চা খেত। চা খাওয়াটা উপলক্ষ মাত্র। বসে বসে গল্প করাই লক্ষ্য। আংটি নিজের গানের কথা বলত তাকে, প্রদোষ বলত ছবির কথা। কোন দিন বসত গিয়ে পার্কে। জনবিরল অখ্যাত অচেনা সব পার্কে। প্রদোষ বসে বসে স্কেচ করত, আংটি পিছনে বসে বসে গুন-গুন করত।

প্রদোষ বলত, 'প্রত্যেকের ছবিতে থাকে রঙ। আমার ছবিতে অতি-রিক্ত কিছু থাকবে। কি, বল তো?'

আংটি মৃদু হেসে বলত, 'কি জানি।'

প্রদোষও হাসত, 'গুন-গুনানি ছাড়া তুমি আর কিইবা জানো। আমার ছবিতে সেই গুন-গুনানিটুকু ধরে নেব। আমার ছবি যারা দেখবে তারা শুধু চোখ দিয়ে দেখবে না, কান দিয়ে শুনবে।'

কত অসম্ভব কথাই না তখন বলত প্রদোষ। প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বাসের তো কোন মানে নেই, আছে শুধু সুর, আছে শুধু রঙ।

আংটি হেসে বলত, 'আর আমার গানের কি দশা হবে?'

প্রদোষ বলত, 'তোমার গানে আমি রঙ লাগাব। তুমি যখনই গান ধরবে অমনি তুলি হাতে উঠে আসব।'

আংটি হাসত, 'রক্ষা কর। তোমার তুলির পোঁচ তাহলে আমার মুখে ঠোঁটে লেগে যাবে।'

প্রদোষ আংটির চোখের দিকে তাকিয়ে হাসত, 'ঠোঁটে যদি একটু লাগে, লাগলই না হয়।'

আংটি চোখ নামিয়ে বলত, 'না না, এখন না।'

শরীর সম্বন্ধে সংকোচ বড় বেশি ছিল আংটির। কদাচিৎ তার হাতখানা প্রদোষকে যে ছুঁতে দিত, ধরতে দিত ; তার চেয়ে বেশি কিছুতেই এগোতে দিত না। তাছাড়া থেকে থেকে মুখে কিসের একটা বিষাদের ছায়া পড়ত আংটির। তার বাবার গোঁড়ামি যেমন কম, মামা মামীর তা নয়। তাঁরা প্রদোষের সঙ্গে মেলামেশাটা তেমন পছন্দ করছেন না। কড়া শাসন না হোক এক-আধটু সমালোচনা বেশ শুনতে হচ্ছে আংটিকে। হয়তো তার বাবাকে তাঁরা চিঠিপত্রও লিখেছেন।

কিন্তু প্রদোষ বেপরোয়া। সে ওসব গ্রাহ্য করে না। গোপনে দেখা সাক্ষাতের জন্য সে নিত্যনতুন কৌশল বার করে।

তারপর একদিন বিকেলে ইডেনগার্ডেনের এক নিরালা কোণে, জলের ধারে, ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসে প্রদোষ বলল, 'তোমার জন্যে, আজ একটা নতুন জিনিস এনেছি আংটি, বল তো কি।'

'কি করে বলব।'

প্রদোষ বলল, 'ভয় নেই শাড়ি গয়নার মতো ভারী জিনিস কিছু নয়। আমি তো রোজগার করি নে। ও সব কোত্থেকেই বা আনব।'

বলে হাতের মোটা একসারসাইজ খাতাটির ভিতর থেকে একখানা ছবি বার করল প্রদোষ, আংটির রঙীন প্রতিকৃতি। নিচে নাম লেখা "রঞ্জনা।" নিজের বহু ছবি এর আগেও প্রদোষের হাত থেকে উপহার পেয়েছে আংটি। অপটু হাতের অনেক ছবিতেই আংটির ঠিক নিজের মুখের আদল, চেহারার আদল আসে নি। সেই তুলনায় আজকের

ছবিটার খুঁত অনেক কম। আংটির সঙ্গে প্রদোষের আঁকা এই মেয়েটির সাদৃশ্য বেশি।

আংটি বলল, 'ছবিটা আমার। কিন্তু নামটা তো দেখছি আর একজনের।'

প্রদোষ বলল, 'আর একজনের কেন হবে। তোমারই নাম ভালো করে দেখ নিচে এক লাইনের কবিতাও আছে।'

আংটি এবার লক্ষ্য করে দেখল, তাই তো কবিতাই তো। ছবির নিচে সে যাকে সুন্দর একটি লতা মনে করেছিল, তা লতা নয়, লতানো কয়েকটি অক্ষরের মালা। একটি কবিতার পংক্তি। 'তোমার নতুন নাম রেখেছি রঞ্জনা।'

আংটি খুশী হয়ে বলল, 'বাঃ সুন্দর হয়েছে তো লাইনটি। শুধু ছবিই আঁক নি কবিতাও এঁকেছ। কিন্তু একটি লাইন কেন। কবিতা তো অন্ততঃপক্ষে দ্বিপদী হবে। আর একটি লাইন লিখে দাও নিচে।'

প্রদোষ বলল, 'পরের লাইনটা ঠিক মতো এল না। তুমি মিলিয়ে নিয়ো।'

আংটি বলল, 'বাঃ রে আমি কি করে মেলাব, আমি কি কবিতা লিখতে জানি?'

প্রদোষ বলল, 'আমিও জানি নে। দু-লাইন চার লাইনের ছড়া মেলাতে পারি মাত্র। বেশ, কথা না আসে বাকি লাইনটি তুমি শুধু সুর দিয়ে পূরণ করে নিয়ো।'

আংটি বলল, 'তা না হয় নিলাম, কিন্তু সেই সুরকে তো আর তুমি অমন করে আঁকতে পারবে না।'

প্রদোষ বলল, 'সুরলক্ষ্মীকে তো এঁকেছি। আরো আঁকব, তার

ছবি জীবন ভরে আঁকব। আমার দেওয়া নতুন নামটি তোমার তাহলে পছন্দ হয়েছে?'

আংটি হেসে বলল, 'খুব।'

প্রদোষ বলল, 'তা হলে তোমার পোশাকটা পালটাও, মানে তোমার আগেকার পোশাকী নামটা।'

আংটি বলল, 'সেটা বদলাবার আর উপায় নেই। আমাদের কলেজের খাতায় সেটা পাকাপাকিভাবে লেখা হয়ে গেছে।'

প্রদোষ বলল, 'তা হলে উপায়? আমার দেওয়া নামটার কি গতি হবে? ও নাম কি শুধু আমার মুখে ছাড়া আর কোথাও থাকবে না?'

আংটি বলল, 'তা কেন ও নাম থাকবে আমার গোপন খাতায়, আমার গানের খাতায়।'

প্রদোষ বলল, 'শুধু খাতায় নয়। তোমার যখন খ্যাতি বাড়বে, তুমি যখন যশস্বিনী হবে, আমার এই নাম তোমার সেই যশের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। রেডিওতে, রেকর্ডে, লোকের মুখে মুখে থাকবে এই নাম—রঙ্গনা, রঙ্গনা। আমার রঙ্গনা বিশ্বের রঙ্গনা হবে। আমার মনের রঙ, আমার তুলির রঙ মাখা থাকবে সকলের ঠোঁটে।'

শুনতে শুনতে আংটি যে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল, প্রদোষের তা চোখ এড়ায় নি।

একটু বাদে আংটি বলল, 'কিন্তু আমি কি তা পারব? আমি কি অত বড় হয়ে তোমার দেওয়া নামের মান রাখতে পারব? অমন উচ্চ আশাও আমার নেই, তোমার মতো অমন রঙীন স্বপ্ন দেখতেও আমি জানি নে। তোমার জাগরণে রঙ, স্বপ্নেও রঙ। কিন্তু আমার অত রঙ কই? আমার মতো কালো মেয়েকে ওই রঙ্গনা নাম কি মানায়?'

প্রদোষ জোর দিয়ে বলেছিল, 'খুব মানায়, খুব মানায়।' হাতখানা

মুঠির মধ্যে নিয়ে বলেছিল, 'রঙন আমার রঙন, তোমাকে সব মানায়, সব মানায়।'

সেদিন হাত ছাড়িয়ে নেয় নি আংটি, প্রদোষের হাতের মধ্যে তার নরম সুন্দর হাতখানা একটু ঘেমে উঠেছিল শুধু। হাত ছাড়ায় নি, কিন্তু চোখও তোলে নি আংটি। একটু বাদে আস্তে আস্তে বলেছিল, 'কি জানি, আমার যেন কেবল মনে হয়, তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই, তোমার নাম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই।'

অংাটির আশঙ্কার অমূলক হয় নি।

কিন্তু তখনও আশঙ্কার ছায়া শুধু আভাসে। তা সর্বক্ষণ আকাশে বাতাসে ভাসে না। শরতের হালকা মেঘের মতো তা কখনো থাকে, কখনো উড়ে যায়।

আশঙ্কার চেয়ে উৎসাহটা বড় হয়ে উঠল আংটির। গান শেখার উৎসাহ। সঙ্গীতসাধনার নিষ্ঠা। কলেজে পড়তে পড়তে ভরতি হল সুরসদনে। বালীগঞ্জের এই প্রতিষ্ঠানটি তখনই নৃত্য আর সঙ্গীত শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে বেশ নাম করেছে। শহরের অভিজাত ঘরের ছেলে-মেয়েরা এখানে শিখতে আসে, পড়তে আসে। কমিটির মধ্যে আছেন শহরের গণ্যমান্য ধনী আর বিদগ্ধ ব্যক্তিরা। সঙ্গীতে নৃত্যে যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছেন, খ্যাতিমতী হয়েছেন, শিক্ষার ভার রয়েছে তাঁদের হাতে। আংটি ভরতি হল সেখানে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সুরসদনে তার মতো মধুকণ্ঠী আর কেউ নেই। তার কণ্ঠমাধুর্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে।

প্রদোষ খুশী হয়ে বলল, 'কেমন, আমি বলি নি তুমি অসামান্যা?'

আংটি মৃদু হেসে বলল, 'এর মধ্যে অসামান্যতার কি দেখলে? আমার গলা যদি একটু মিষ্টি হয় তার কৃতিত্ব আমি দাবি করতে

পারি নে। আমাকে অনেক শিখতে হবে, অনেক খাটতে হবে। এই তো সবে শুরু।'

প্রদোষ, বলল 'তোমার আর একটি নাম দিতে হবে সুবিনীতা। তোমার বাবা তো বৈষ্ণব নন, তুমি এত বিনয় শিখলে কোথায়?'

আংটি হেসে বলল, 'যদি বলি তোমার কাছে।'

প্রদোষ বলল, 'কেউ বিশ্বাস করবে না। আমার বিনয় আছে এমন অপবাদ শত্রুতেও দেয় না। আমার মত অহঙ্কারী পুরুষ আর দুটি নেই। কি করব বল। আমাদের তো গয়না-গাটি নেই। আমাদের সমস্ত অলংকার ওই মুখের অহঙ্কারের মধ্যে।'

আংটি বলল, 'অহংকার তোমাকে মানায়, তুমি তাই করতে পার। কিন্তু আমাকে তো তা মানায় না।'

প্রদোষ বলল, 'বেশ না মানায়, বিনয়ই কর। ভারসাম্য রাখবার জন্যও তোমার বিনয় চর্চা দরকার।'

আংটির মামা গঙ্গাধরবাবু মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন। অনেক-গুলি ছেলেমেয়ে। অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়। আংটিকে অনেক কাজ করতে হয় সংসারের। ঘরদোর গুছানো তো আছেই, তা ছাড়া মামাতো ভাইবোনদের সেবাযত্ন দেখাশোনার দায়িত্বও সে নিজেই নিয়েছে। এসব কাজ করে যেটুকু সময় পায় আংটি গান নিয়ে বসে। অনেক রাত অবধি রেওয়াজ করে, গান সম্বন্ধে পড়াশুনো করে। আই-এ পরীক্ষা দেবার আগেই আংটি কলেজের পড়া ছেড়ে দিল।

প্রদোষ বলল, 'এ কি কাণ্ড? পড়া ছাড়লে কেন? অন্তত গ্রাজুয়েট হয়ে নেওয়া তোমার উচিত ছিল।'

আংটি বলল, 'উচিত ছিল বুঝি। কিন্তু গান ছাড়া কিছুতে আমার মন বসে না। সময়ের অপব্যয় বলে মনে হয়। দুটো এক সঙ্গে চালান যায় না। তুমিই কি পেরেছ?'

প্রদোষ বলল, 'তা পারি নি। কিন্তু আমার কথা আলাদা। তোমার প্রতিভা ঘর ঝাঁট দেওয়ায় আর বাসন মাজায় নষ্ট হয় দেখে আমার সয় না! তুমি পৃথিবীতে ও সবের জন্যে আস নি। এক কাজ কর। তোমার ওই মামার বাড়ি ছাড়। একটা হস্টেল-টস্টেল ঠিক করে নাও। তোমার খরচ চালাতে পারবেন না এত খারাপ অবস্থা তোমার বাবার নয়।'

আংটি বলল, 'তিনি বড়লোকও নন। তাছাড়া মা চিররুগ্ন। তাঁর চিকিৎসার ব্যয় আছে। ভাইবোনদের পড়াশুনোর খরচ আছে, বিধবা পিসিমাকেও কিছু কিছু পাঠাতে হয়। খরচ কি কম? কিন্তু সেজন্যেও নয়। আমি দু-একটা টিউশনি করলে আলাদা হস্টেলে গিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু মামা মামী আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চান না। আর মামাত ভাইবোনগুলি আমার এত ন্যাওটা হয়েছে যেন আমার ভাই-বোনদের চেয়েও বাড়া। আমাকে নিয়ে ওদের গর্বের শেষ নেই, পাড়ার সবাইর কাছে বড়াই করে বেড়ায় তাদের বড়দির মতো ভালো গান নাকি কেউ গাইতে পারে না। এত লজ্জা করে আমার। ওদের যে কি করে ছেড়ে আসব তাই ভাবি।'

ভাবনাটা আরো বাড়ল আংটির। অতিরিক্ত ব্লাডপ্রেসারে ওর মা হঠাৎ মারা গেলেন। ওর বাবা পড়লেন মহা অসুবিধায়। বাড়িতে আর কোন মেয়েছেলে নেই। আংটি কিছুদিনের জন্যে চলে গেল ব্যারাকপুরে। সেখান থেকে প্রদোষকে চিঠি লিখল 'আমার কিছু হবে না। গান বাজনার মোটেই সময় পাচ্ছি না।'

প্রদোষ জবাবে লিখল, 'রঙন, তুমি সব ছেড়েছুড়ে চলে এস। সত্যিকারের যে শিল্পী তার নিষ্ঠুর না হলে চলে না। তাকে এক হাতে ছুরি নিয়ে চলতে হয় পথের সব বাধা, সব বন্ধন কেটে কেটে আসবার জন্যে। তার মধ্যে স্নেহের বন্ধনও পড়ে।'

কিন্তু সব ছেড়ে এল না আংটি, সব জড়িয়ে নিয়ে এল। আলীপুর কোর্টে বদলী হলেন নীরদবাবু। চেতলায় আংটির মামাবাড়ির কাছে আর একটা বাড়ি সস্তায় পাওয়া গেল। সেই বাড়ি ভাড়া নিলেন নীরদবাবু। আর আংটি হল দুই বাড়ির মধ্যবর্তিনী, দুই বাড়ির মধ্যমণি। দুই বাড়ির ছেলে মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া লাগলে তা মিটিয়ে দেয়, বড়দের বিরোধের সময়ও সে সালিশী করে।

প্রদোষ তাকে একদিন ধমক দিয়ে বলল, 'আংটি, দোহাই তোমার গান বাজনা তুমি ছেড়ে দাও। বিয়ে-থা করে একপাল ছেলে মেয়ের মা হও। আর না হয় সমাজ হিতৈষিণী সমিতিতে নাম লেখাও। শিল্পের সাধনা তোমার জন্যে না।'

আংটি হেসে বলল, 'আমার নাইবা হল তরী বাওয়া, তোমার তো হোক।'

তা একটু একটু খ্যাতি তখনই হয়েছে বইকি প্রদোষের। ইণ্ডিয়ান পেইন্‌টিং-এ কলেজ থেকে ভালোভাবেই পাশ করেছে প্রদোষ। একজিবিসনে ছবি পাঠালে তা ক্রিটিকদের নজরে পড়ছে। সুখ্যাতির সঙ্গে দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে তা ছাপা হচ্ছে। অবশ্য যে পরিমাণে খ্যাতি হচ্ছে সেই পরিমাণে ছবির বিক্রি এবং অর্থমূল্য না বাড়লেও খাওয়া পরার ভাবনা তেমন নেই। তার এক গুণমুগ্ধ পরিতোষ সিং-এর বাবা শ্যামবাজার অঞ্চলে নামকরা থিয়েটারের মালিক। তিনি তাকে কাজ দিয়েছেন। তার শিল্পবোধের উপর পঞ্চানন দত্তের খুব আস্থা।

মঞ্চসজ্জা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পোশাক পরিচ্ছদ, মেক-আপ সম্বন্ধে প্রদোষ পরামর্শ দেয়, হাতে কলমে দেখিয়েও দেয় মাঝে মাঝে। অবশ্য কাজ যতখানি করিয়ে নেন মাইনে সেই পরিমাণে দেন না পঞ্চানন বাবু। তা না দিলেও হ্যারিসন রোডের জেনিথ হোটেলে পুরো একটি ঘর নিয়ে থাকবার খরচটা তাতে বেশ কুলিয়ে যায়।

থিয়েটারের সঙ্গে প্রদোষের এই ঘনিষ্ঠতা তার বাবা প্রফুল্লবাবু মোটেই পছন্দ করেন নি। তিনি বলেছিলেন, 'ও জায়গায় ভদ্রলোক যায় না।' এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তার মনোমালিন্য চলছিল। তিনি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই লিখছিলেন, 'চলে এস। অন্য কোন চাকরি-বাকরি যদি নাই জোটে বাড়িতে এসে থাক। আমার যা আছে তাতেই তোমার চলবে। ওখানে রোজগার করা পয়সা কেউ বাড়িতে আনতে পারে না। বরং নিজের বাড়ি ঘর উর্বশীদের পায়ে বাঁধা দিয়ে আসে। আমি অনেক দেখেছি।'

কিন্তু এই থিয়েটারের অভিজ্ঞতা উপলক্ষ করেই শিখার সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল। সুরসদনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ওখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হবে। অনেক দিন ধরেই তার উদ্যোগ-আয়োজন চলছে। তার খোঁজ-খবর আংটির কাছে প্রায় পাচ্ছিল প্রদোষ। নিজেরা বাসা করবার পর থেকে আংটি তাকে সেখানেই ডাকে। প্রদোষ তো আংটির বাবার অপরিচিত নয়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি তাকে চেনেন, স্নেহ করেন। তাকে বাড়ির ছেলের মতো মনে করেন তিনি। তবুও প্রদোষের কেমন মনে হয়, আজকাল গেলে নীরদবাবু যেন তেমন প্রসন্ন হন না। একটু যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। দু-একটা কথা বলেই উঠে চলে যান। অন্য ঘরে গিয়ে আইনের বই খোলেন, কি রায় লিখতে বসেন।

প্রদোষ বলে, 'তোমার বাবা বোধ হয় আমাকে আজকাল আর তেমন পছন্দ করেন না আংটি।'

আংটি বলে, 'তোমার যত বাজে কথা। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই উনি ওই রকম গম্ভীর হয়ে গেছেন। এত চেষ্টা করি ওঁকে আনন্দে রাখবার, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠি নে। বাবা শুধু বেছে বেছে দুঃখের গানগুলি শুনতে চান। করুণ রস ছাড়া আর কোন রস ওর ভালো লাগে না।'

প্রদোষ বলে, 'তাতে ভাববার কিছু নেই। যে কোন রসই হোক না কেন রস পেলেই হল। শুধু দেখবে যেন নীরস না হয়ে যান। হৃদয়টা যেন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে না যায়। তার বদলে চোখ দিয়ে যত জল ঝরে ঝরুক, অতিবৃষ্টিকে ভয় নেই, ভয় অনাবৃষ্টিকে।'

আংটি বিরক্ত হয়ে বলে, 'তুমি যে ভাবে কথা বল তাতে তোমার প্রাণে মায়াদয়া আছে বলে মনে হয় না।'

প্রদোষ বলে, 'রাগ কোরো না আংটি, প্রাণের মায়াদয়াটা ভদ্রলোকে আজকাল মুখে প্রকাশ করে না। তাতে পড়শীরা হাসে। বলে সেন্টি-মেন্টাল, বলে বোকা। নাগরিকের সাধনা হল কায়মনোবাক্যে বিভিন্ন হওয়ার সাধনা। এক বললেন আমি বহু হব। এও তাই। এ যুগে বহুরূপী না হতে পারলে তোমার রূপ কেউ স্বীকার করবে না।'

সেদিন এক চিরকুট দিয়ে প্রদোষকে আংটি ডেকে পাঠাল, 'খোকনদা জরুরী দরকার—শিগগির এসো।' চিঠি পেয়ে থিয়েটারে ফোন করে দিল প্রদোষ। সে আজ যেতে পারবে না, শরীর খারাপ। বিছানা থেকে নড়বার জো নেই, তারপর ছুটতে ছুটতে চলল চেতলায়। বুক ঢিপ-ঢিপ করছে। আংটির বাবার কিছু হল নাকি। কিন্তু বাড়ির

কাছে যেতেই ভুল ভাঙল। ভিতর থেকে সুরেলা গলা শোনা যাচ্ছে আংটির। আর সেই গলা ছাপিয়ে উঠছে একটি ঘুঙুরের শব্দ। কি ব্যাপার, আংটি কি নাচতেও শুরু করল নাকি। কড়া নাড়তে আংটির ছোট ভাই কানাই এসে দোর খুলে দিল। প্রদোষ বলল, 'তোমার দিদি কি নাচও প্র্যাকটিস করছে আজকাল?'

কানাই হেসে বলল, 'দিদি হবে কেন, শিখাদি। দিদির বন্ধু। চিত্রাঙ্গদার রিহার্শেল হচ্ছে। দেখবেন আসুন।'

"শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান,

মন রয় না রয় না রয় না ঘরে চঞ্চল প্রাণ।"

দেখবার আগেই শুনতে পেল প্রদোষ। মনের মধ্যে সেই চাঞ্চল্য অনুভব করল।

প্রদোষের আসবার খবর পেয়ে দোর খুলে দিয়ে আংটি যখন তাকে ভিতরে ডাকল তখন নাচ থেমে গেছে, গান থেমে গেছে, কিন্তু রেশটুকু শেষ হয়ে যায় নি। প্রশস্ত ঘরে মাদুরের ওপর বসে একদল অপরিচিত মেয়ে। রঙ বেরঙের শাড়ির আবরণে এক গুচ্ছ ফুলের স্তবক। আর তাদের সামনে দাঁড়ানো স্বয়ং ফুলের রানী। দীর্ঘাঙ্গী তন্বী রূপময়ী বর্ণময়ী এক তরুণী। তার দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই নৃত্যের ভঙ্গিমা রয়ে গেছে। সে একটু শ্রান্ত। বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরে নাচের মহড়া চলেছে। কিছু কিছু ঘাম জমেছে কপালে, কপালের ওপর নেমে আসা এলোমেলো কয়েক গাছি চুলের মধ্যে। কিন্তু এত শ্রান্তি সত্ত্বেও তার ঠোঁটে মৃদু হাসি লেগে রয়েছে। সে হাসি আরো মধুরতর হল, গভীরতর হল, গূঢ়তর হল। কাজলকালো চোখ আর চোখের কালো কাজল কৃষ্ণতর হল, ঘনতর হয়ে উঠল যেন। সেই চোখ থেকে নিমেষের মধ্যে প্রদোষের বুঝতে বাকি রইল না অতল সমুদ্র কোন এক

খুশীর উল্লাসে উতলা হয়ে উঠছে। প্রদোষ শুধু মুগ্ধ হয় নি, মুগ্ধ করেওছে। সে যে রূপবান পুরুষ, অত্যন্ত রূপবান পুরুষ তা যেন নতুন করে অনুভব করল প্রদোষ। এর আগে অনেক বন্ধু, অনেক আত্মীয়-স্বজন যে কথা বলেছে। শুনে শুনে যে সব কথার ধার বসে গিয়েছিল। কিন্তু আজ আর শোনা নয়, দেখা। আজ এক অসামান্যা রূপময়ী নারীর স্বচ্ছ চোখে, মুগ্ধ চোখে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল প্রদোষ, এই যেন প্রথম স্বরূপ প্রত্যক্ষ করল।

একটি মুহূর্ত তো নয়, একটি যুগ। কিসের শব্দে চমক ভাঙল প্রদোষের। আংটি বলল, 'এসো, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

প্রদোষ মনে মনে ভাবল পরিচয় যেন তাদের এর আগেই হয়ে যায় নি। যেন পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় আছে তারা।

আংটি বলল, 'আমাদের চিত্রাঙ্গদা দীপশিখা কুণ্ডু।' কুণ্ডু কথাটা কানে সুশ্রাব্য লাগল না প্রদোষের। কিন্তু আংটি বলে চলেছে, 'আর এঁর কথা তো তোমাকে আগেই বলেছি শিখা।'

শিখা অপরূপ ভঙ্গি করে বলল, 'বলেছ নাকি। কই আমার তো কিছু মনে নেই আংটিদি।'

আংটি হেসে বলল, 'খুব মনে আছে, মানে আর একবার শুনতে চাও।'

শিখা বলল, 'উঁহু মানে আর একবার শোনাতে চাই, আর একবার বলাতে চাই। পিছন থেকে বলার সঙ্গে সামনে থেকে বলাটা মিলিয়ে দেখতে চাই।'

আংটি হেসে বলল, 'তাহলে দেখ। প্রদোষকুমার বসু। ছবি আঁকেন। ওঁর ভালো ভালো ছবিগুলি দেখেছ?'

শিখা বলল, 'নিজের পোর্টেট ছাড়া আর কিছু কি ওর আঁকবার দরকার হয় ?'

আংটি এবার হেসে বলল, 'বাবাঃ, তোষামোদের একটা সীমা আছে কিন্তু তুমি সব ব্যাপারে সীমা ছাড়ালে। খোকনদা এতদিন যোগ্য আয়না পায় নি বলেই বোধ হয় কাঠের ইজেলের কাছে গিয়ে বসে। এরপর থেকে কি করবে বলা যায় না।'

কথা তো নয় সূক্ষ্ম তুলির এক একটি আঁচড়। এমন আঁচড়ে নিজের রূপকে পরিস্ফুট হতে এর আগে কোন দিন দেখে নি প্রদোষ। এর আগে রূপের প্রশংসা করে অনেক মেয়েকে সে অপ্রতিভ করেছে। কিন্তু আজ নিজে অপ্রতিভ হল এক প্রতিভাময়ীর কাছে। প্রথম দিনেই প্রথম আলাপেই প্রদোষ বুঝতে পারল নৃত্যনিপুণা শিখা শুধু ইশারাময়ী, ইঙ্গিতময়ী ভঙ্গীময়ী নয়; অতি কুশলা বাঙ্ময়ীও। মুহূর্তের মধ্যে সে যে-কোন পুরুষের হৃদয়-দুর্গে চিন্ময়ীর আসন নেয়। কিন্তু প্রদোষকে দুর্গদ্বার বন্ধ করতে হবে। সতর্ক পাহারা বসাতে হবে চার দিকে। সেখানে আর কারো প্রবেশের অধিকার নেই। সে আসন তার রঙ্গনার রঙে চিরদিনের জন্যে রঞ্জিত হয়ে আছে।

প্রদোষ শতরঞ্চির ওপর বসে পড়ে বলল, 'বিপদের কথা বলে মিছামিছি আমাকে ডেকে আনলে আংটি, আমার চাকরি থাকবে না।'

আংটি বলল, 'থাকবে, থাকবে। তোমার মতো মানুষের চাকরির অভাব কি ?'

'তার মানে আমি কি চাকর হওয়ার জন্যেই জন্মেছি ?'

শিখা বলল, 'ওকি কথা! আপনারা গুণের আধার, বিশ্বসুদ্ধ লোক আপনাদের ভক্ত।'

প্রদোষ বলল, 'বিশ্বের কথা থাক। আপনি তো আমার কোন গুণের পরিচয় পান নি, কোন গুণ স্বীকার করেনও না।'

শিখা বলল, 'স্বীকার করবার জন্যই ডেকেছি। ব্যাপারটা সব শুনুন আংটিদির কাছে।'

বিপদের বিবরণটা আংটিই সবিস্তারে জানাল। তাদের দলে যে স্টেজ সাজায়, মঞ্চকে রূপময় করে আর রূপময়ীদের অপরূপ করে মঞ্চস্থ করবার ভার নেয় সেই প্রভাত সেন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার জায়গায় যোগ্য লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আংটি সুপারিশ করেছে প্রদোষের নাম। কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করেছেন, কারণ প্রদোষ অখ্যাতনামাও নয়, তাঁদের কাছে অপরিচিতও নয়। এখন প্রদোষ রাজী হলে সবাই বাঁচে। শিখা তো ভাবনায় পড়েছে। উপযুক্ত মেক-আপ ছাড়া সে নামবে কি করে।

প্রদোষ বলল, 'আপনার আলাদা মেক-আপের দরকার আছে বলে তো মনে হয় না।'

শিখা বলে, 'দরকার না থাকলে আপনারা যে বেকার হতেন।'

খানিক বাদে শিখা দলবল নিয়ে বিদায় নিল। অনেক দূরে তাদের বাড়ি। হাতীবাগান। কিন্তু নিজেদের রথ আর সারথি সব সঙ্গে আছে। তাড়াতাড়িই পৌঁছে দিতে পারবে।

শিখা বলল, 'আপনিও চলুন না আমাদের গাড়িতে। পথে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

প্রদোষ বলল, 'পথেই যদি নামাবেন তা হলে আর গাড়িতে যাওয়ার দরকার কি। পথের সঙ্গী দুটি পা-ই তো আছে।'

শিখা হেসে বলল, 'ও। আচ্ছা ফাংশন শেষ হোক। তারপর

আংটিদিকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে যাবেন। নিজের মুখে নিমন্ত্রণ করে গেলাম। পত্রদ্বারা নয় যে ত্রুটি ধরবেন।'

ওরা চলে যাওয়ার পর আরো কিছুক্ষণ দেরি করল প্রদোষ। আংটির ভাইবোনদের সঙ্গে আলাপ করল, তার বাবার স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিল, আইন-কানুন সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাতে গিয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করে বসল। তারপর চা-টা খেয়ে বিদায় নিল। সদর দরজা অবধি আংটি তাকে এগিয়ে দিতে এল।

'তুমি তা হলে রাজী আছ তো?' আংটি জিজ্ঞাসা করল। প্রদোষ বলল, 'তুমি যখন বলছ রাজী না হয়ে করি কি।' আংটি একটু হাসল।

'কেবল আমি বলছি বলেই বুঝি?'

'তা ছাড়া কি?'

আংটি তেমনি হেসে বলল, 'তা ছাড়া আরো কিছু আছে। একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?'

'বল।'

'তোমার রঞ্জনা নামটা যাকে মানায় এতদিনে তুমি তার দেখা পেয়েছ।'

প্রদোষ রাগ করে বলল, 'ছি আংটি। এ ধরনের ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। রঞ্জনা নাম তোমারই। ও নাম আর কারো নয়। যাকে ভালবাসি তার রঙ তো গায়ে নয়, তার রঙ মনে।'

আংটি একটু হাসল, 'আমার তো মনে হয় আমি যাকে ভালবাসি তার রঙ তার গায়ে নয় মনে নয়, শুধু বাক্যে।'

প্রদোষ বলল, 'আমি আর দাঁড়াব না। তুমি আজ ঝগড়া করবার জন্যে কোমর বেঁধে এসেছ।'

আংটি অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'আমি ঠাট্টা করছিলাম। তুমি আমাকে বড় ঠাট্টা কর কিন্তু আমার মুখের ঠাট্টা শুনলে অত চটে যাও কেন।'

সেদিন হোটেলে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ছবি আঁকতে ইচ্ছা করল প্রদোষের। কাগজ-পেনসিল নিয়ে স্কেচ করতে বসল। ভাবল আংটির একটি ছবি আঁকবে। দোরের আড়ালে আধখানা ঢাকা, আধখান প্রকাশিত যে আংটিকে সে এইমাত্র দেখে এসেছে তাকে ফুটিয়ে তুলবে। কিন্তু রেখা-চিত্রে যে মুখের আদল ফুটে উঠল সে আর একজনের মুখ। দীর্ঘদিনের যে চেনা মুখখানিকে সে এতদিন ধরে দেখে এসেছে, এতদিন ধরে এঁকে এসেছে আজ কিছুতেই তার মুখখানাকে কাগজে পেন্‌সিলে ধরে আনতে পারল না। বিরক্ত হয়ে পেন্‌সিল ঘষে ঘষে সত্ত আঁকা মেয়েটির মুখের উপর ঘোমটা পরিয়ে দিল।

সুরসদনের প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠান খুব চমৎকার হল। বিশেষ করে নৃত্যনাট্যের পালাটি সুন্দর জমে উঠল। মঞ্চসজ্জা, আলোক-সম্পাতের প্রশংসা করল সবাই। সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল শিখা নিজে। মদনের বরে বর্ষকাল স্থায়ী রূপময়ী চিত্রাঙ্গদার নৃত্যাংশ শেষ করে সে গ্রীনরুমের মধ্যেই প্রদোষকে বলল, 'আপনি যেভাবে সাজিয়েছেন তাতে আজ নিজেকে সত্যিই চিত্রাঙ্গদা মনে হচ্ছে। আজ যদি ফাংশন ভালো হয়, তার মূলে আপনি।'

অথচ নতুন কিছু করতে পারে নি প্রদোষ। পেশাদার থিয়েটারে যা ব্যবহার করে এখানেও তাই করেছে। সেই লিকুইড হোয়াইট দিয়ে মুখ ধুইয়ে দিয়েছে শিখার। ফাউণ্ডেশনের জন্যে পাউডার মাখিয়েছে। রেড দিয়েছে গালে আরে ঠোঁটে। চোখের কোণে কাজল পরিয়ে দিয়েছে সূক্ষ্ম রেখায়। যা সবাই করে প্রদোষও তাই করেছে। কিন্তু এমন

করে মেকআপ-ম্যানের হাতে কোন আর্টিস্ট বোধ হয় নিজেকে ছেড়ে দেয় না। কোন খুঁতখুতি নেই, নিজস্ব কোন মতামত নেই। শিখা বলেছে, 'আমি কিছু বলব না। মনে করুন আমি আপনার সাদা ক্যানভাস। আপনি তুলি হাতে আপনার মনের মতো করে আপনার চিত্রাঙ্গদাকে এঁকে তুলছেন। আপনি তো সাধারণ মেকআপ-ম্যান নন, যে বলে বলে দেব। আপনি গুণী শিল্পী।'

প্রদোষ বলেছে, 'আমরা সাদা কাগজে ক্যানভাসে ছবি আঁকি। কিন্তু আঁকা ছবিকে ফের কি করে আঁকব।'

শিখা জবাব দিয়েছে, 'আঁকা ছবি যাতে শুধু পটে আঁকা ছবি হয়ে থাকে না, যে ছোঁয়ায় প্রাণ পায় সেই finishing touch দিন তা হলে।'

সেদিনকার অনুষ্ঠানের সবাই খুব প্রশংসা করল। সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, আবৃত্তি সবই ভালো হয়েছে। এমন টিম-ওয়ার্ক সাধারণত দেখা যায় না। দল তো নয় একটি শতদল। তার মধ্যে শিখার নাচ হয়েছে সবচেয়ে ভালো। তার পার্টনার অর্জুন তার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। শিখা যেন এক নতুন প্রেরণা, নতুন উদ্দীপনা পেয়েছিল। সে উদ্দীপনার উৎস যে কে তা কারোরই নজর এড়ায় নি।

সুরসদনের সেক্রেটারী প্রদোষকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'আপনার কাজের সবাই সুখ্যাতি করছে, আপনাকে আমরা আর ছাড়ছি নে।'

ফাংশনে শিখার বাবা আর মা এসেছিলেন বিশেষ অতিথি হিসাবে। কুমুদবন্ধু কুণ্ডু উত্তর-বঙ্গের বড় জমিদার। ডুয়ার্সে কয়েকটি বড় চা-বাগানের অংশও আছে। কিন্তু শুধু ভূমি আর ভূমিজ সম্পত্তির ওপর নির্ভর করে থাকেন নি কুমুদবন্ধু। কলকাতায় আমদানি-রপ্তানির ব্যবসাও আছে। ছেলেরা সবাই কৃতবিদ্য। ডাক্তার, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনীয়ার,

কেউবা নিজেদের ব্যবসার তদারক করে। হাতীবাগানে বিরাট বাড়ি। আজকাল তো আর শহরে হাতী বাঁধবার রেওয়াজ নেই। হাতীর মতই দুখানা গাড়ি পড়ে থাকে গ্যারেজে।

শিখা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার বাবা, মা। আর ইনি প্রদোষ বসু। এঁর জন্যেই ফাংশনটা আজ এত ভালো হল।'

কুমুদবাবু বললেন, 'ও। এই ছেলেটিই বুঝি অর্জুন সেজে নেচেছিল ?

শিখা বলল, 'না বাবা।'

শিখার মা সুহাসিনী বললেন, 'হাসছিস কেন। মদন সেজেছিল বুঝি। সাজ-পোশাক ছেড়ে এসেছে কিনা, ভালো করে চিনতে পারছি নে।'

শিখা তেমনি হাসতে হাসতে বলল, 'উনি কিছুই সাজেন নি মা, সবাইকে সাজিয়েছেন।'

কুমুদবাবু বললেন, 'ও, তোদের মেকআপ-ম্যান বুঝি ? তা বেশ ভালোই সাজিয়েছিলেন মশাই। নমস্কার, নমস্কার। চুড়ো-টুড়োগুলি ভালোই বেঁধেছিলেন। দেখতে বেশ হয়েছিল।'

শিখা বলল, 'সাধারণ মেকআপ-ম্যান নন বাবা। আর্ট স্কুল থেকে ভালোভাবে পাশ করেছিলেন। ওঁর আঁকা ছবির খুব সুখ্যাতি হয়েছে।'

কুমুদবাবু আবার বললেন, 'বেশ বেশ।'

শিখা বলল 'আমাদের গাড়িতে আসুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।'

প্রদোষ বলল, 'না না, আমি অমনিই যেতে পারব। যাই এবার ওদিকে।'

শিখা প্রদোষের দিকে একটু তাকাল, তারপর হেসে বলল, 'হ্যাঁ যান। আংটিরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

কিন্তু কোথায় আংটি। প্রদোষ তাকে সুর-সদনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেল না, বাইরেও নয়। এমন তো কোনদিন হয় না। এর আগে প্রত্যেকটি ফাংশন শেষ হওয়ার পর প্রদোষ সঙ্গে করে তাকে বাসায় পৌঁছে দিত। অবশ্য আংটি প্রায়ই একা যেত না। তার ভক্তের দলে পরিবৃত হয়ে চলত। প্রদোষ সেই দলের মধ্যে থাকলেও সে যে দলপতি তা আংটির ব্যবহারে গোপন থাকত না। আজ হল কি আংটির।

প্রদোষ ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল ওদের চেতলার বাসায়। আংটিদের ট্যাক্সি তার একটু আগে পৌঁছেছে। তারা নামছে গাড়ি থেকে।

প্রদোষ হেসে বলল, 'দৌড়ের কম্পিটিশনে বেশি জিততে পার নি আংটি। বড়জোর আধ মিনিট কি এক মিনিট।'

আংটি বলল, 'আমি জিতি নি, আমার আজ হারের পালা। কিন্তু তুমি কষ্ট করে আবার এতরাত্রে এলে কেন।'

প্রদোষ বলল, 'তুমি না বলে কেন চলে এলে সেই কথা জিজ্ঞেস করতে।'

আংটি সে কথার কোন জবাব দিল না।

প্রদোষ বলল, 'তোমার গানগুলি আজ চমৎকার হয়েছে।'

আংটি একটু হাসল, 'কনসোলেশন প্রাইজ দিচ্ছ?'

প্রদোষ বলল, 'তা কেন। সবাই প্রশংসা করছিল। বিশেষ করে, —কোন মায়া লাগল চোখে—গানটি অপূর্ব হয়েছে।'

কিন্তু প্রদোষ যত সুখ্যাতিই করুক আলাপটা সেদিন ভালো করে জমল না, জমতে দিল না আংটি।

এদিকে শিখার সঙ্গে তার আলাপ এগিয়ে চলল। আরো কয়েকটি

নৃত্য-অনুষ্ঠান হল। শ্যামা, চণ্ডালিকা, শাপমোচন। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি ছাড়া আরো অন্য নাটকও করল তারা। রাসলীলা, বুদ্ধলীলা। আর প্রত্যেকটিতে মঞ্চসজ্জার, অঙ্গসজ্জার ভার নিল প্রদোষ। তার নিজের ছবি আঁকার আর সময় নেই। তার সৃষ্টির মাধ্যম বদলে গেছে। তা আর রঙ নয়, তুলি নয়, কাগজ নয়, ক্যানভাস নয়—নরনারীর দেহ। সেই দেহের পটভূমিতে রূপসৃষ্টি করে যায় প্রদোষ! এ যুগের নরনারীকে নিয়ে যায় বৌদ্ধযুগে, নিয়ে যায় পৌরাণিক যুগে, বলতে চায় মানুষ কোন বিশেষ যুগের নয়—সে চির-যুগের, চিরকালের। শুধু বেশ আর পরিবেশের তফাত। কিন্তু তাই বলে এই বেশ আর ভূষণ তো তুচ্ছ নয়। এদের অবলম্বন করেই তো রূপ আব রূপান্তর। সেই রূপ—বিভিন্ন যুগের পুরুষ আর নারীর অঙ্গসজ্জাই হল প্রদোষের চিন্তা-কল্পনা-গবেষণার বিষয়। এ সম্বন্ধে অনেক বই কিনল, অনেক বই পড়ল, মেয়েদের বিভিন্ন ছাঁচের কবরী আর বেণীর প্যাটার্নের নোট নিতে নিতে নিজেও দু-একটি ছাঁদ উদ্‌ভাবন করল। ভারি খুশী হয়ে উঠল প্রদোষ। মনে মনে বলল, 'আমার এই খুশী হওয়ার সঙ্গে ছবি এঁকে খুশী হওয়ার কোন তফাত নেই।'

তার সহপাঠী শিল্পী বন্ধু অমলেশ নন্দী একদিন এসে হানা দিল তার ঘরে—দারুণ নিন্দা করে বলল, 'ছি ছি একি করছ।'

প্রদোষ বলল, 'কেন।'

অমলেশ বলল, 'ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। লজ্জা করে না তোমার। নিজের হাতে নিজের অপমৃত্যু ডেকে আনছ তুমি।'

প্রদোষ হেসে বলল, 'দেখ মৃত্যু না হলে পুনর্জন্মের আশা নেই। এ

ব্যাপারে আমি ঘোরতর হিন্দু পৌত্তলিক, তোমাদের একটি মিডিয়াম নিয়ে লেগে থেকে অমর হবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। আমি রোজ মরব, রোজ জন্মাব। আর মিডিয়াম বদলে বদলে দেহান্তর ঘটাব।'

অমলেশ বলল, 'তোমাকে যে এ বুদ্ধি দিয়েছে সেই অঘটনঘটন-পটীয়সীটি কে?'

প্রদোষ বলল, 'সে আর কেউ নয়। আমারই কল্পচারিণী রূপলক্ষ্মী।'

অমলেশ বলল, 'তাকে লক্ষ্মী বল না, আমরা তার নাম জানি। সে অলক্ষ্মী। সে তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে। শুনেছি তার জন্যে একটি ছেলে বিবাগী হয়ে গেছে, আর একজন হাসপাতালে টি বি-তে ভুগছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষতি করল সে তোমার। এক শিল্পী-সত্তার অপমৃত্যু ঘটাল।'

প্রদোষ হেসে বলল, 'তাকে তুমি বড়ই গুরুত্ব দিচ্ছ অমল। আর্টিস্টের কাছে আরো পাঁচটা অনুভূতির মতো প্রেমও একটা মিডিয়াম, তার বেশি কিছু নয়। নারীকে আমি আমার শিল্পসৃষ্টির মাধ্যম ছাড়া আর কোন মূল্য দিই নে।'

অমলেশ হাসল, 'তাই বুঝি মধ্যে মধ্যে এ মাধ্যমও তোমাকে বদলাতে হয়?'

প্রদোষ গম্ভীর হয়ে গেল। সেই দিনই ডাকে এল নীল রঙের খাম। শিখার চিঠি কিছুদিন ধরেই আসছে। প্রদোষও জবাব দিচ্ছে। কিন্তু তাই বলে ধরা দেয় নি। শিখার ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের জবাবে সে নৈর্ব্যক্তিক শিল্পের আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। নিবন্ধ লিখছে বৌদ্ধযুগের অঙ্গসজ্জা কি মোগল আমলের প্রসাধন শিল্প সম্বন্ধে। আর তার ফলে শিখার উদ্দামতা সমস্ত বন্ধন ছিঁড়তে উদ্যত হচ্ছে।'

হেসে শিখার চিঠিটা আজও খুলতে যাচ্ছিল প্রদোষ। সেই মুহূর্তে

রেডিয়োর ঘোষণা শোনা গেল, 'এবার রঞ্জনা গঙ্গোপাধ্যায় একখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাচ্ছেন।'

রঞ্জনা! প্রদোষের দেওয়া নামটি তা হলে সত্যিই ব্যবহার করছে আংটি। তার প্রথম ভালবাসার মেয়ে তার দেওয়া নামে খ্যাতিমতী হয়ে উঠেছে।

রঞ্জনা গেয়ে চলেছে,—'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে'—প্রদোষ বাকি গানটা আর শুনল না। রেডিয়ো বন্ধ করে ঘরের দরজা বন্ধ করল—তারপর রাস্তায় নেমে ট্রাম ধরল। কিন্তু বিদ্যুৎবাহী হলেও ট্রাম তো ঠিক মনোরথের মত ছুটতে পারে না। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সে বার বার থামে, তারপর একবার ট্রলি কেটে যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে রেডিয়ো স্টেশনে যখন হাজির হল প্রদোষ, রঞ্জনা সেখান থেকে চলে গেছে।

প্রদোষ আবার চেতলায় ছুটল। তার একটু আগে রঞ্জনা বাসায় পৌঁছেছে। তার বেশবাস বদলাবার সময় দিল না প্রদোষ। তাকে নিরালায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।'

আংটি একটু হাসল, 'তোমার সব কথাই তো জরুরী কথা। বল কি বলবে।'

প্রদোষ বলল, 'আমাদের বিয়ের দিনটা এবার ঠিক করতে এসেছি। আজই আমাকে কথা দাও। রেজিস্ট্রেশনের সব ব্যবস্থা করি।'

আংটি যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, না মদটদ কিছু খেয়ে এসেছ?'

প্রদোষ বলল, 'এসব কি বলছ আংটি।'

আংটি বলল, 'ঠিকই বলছি। আমি ব্রাহ্মণ, তুমি অব্রাহ্মণ। তোমার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

প্রদোষ একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু আগে তো এসব কথা বল নি। তুমি কি আজকাল জাতিভেদও মান?'

আংটি বলল, 'নিশ্চয়ই মানি। জাতিভেদের চেয়েও বড় ভেদ প্রকৃতি-ভেদ। সে ভেদ শুধু একাল সেকালের নয় চিরকালের। গুরুতর রকমের অমিল তোমার আর আমার মধ্যে রয়েছে খোকনদা। তুমি পাগলামি কোরো না।'

প্রদোষ আকুলভাবে আংটির হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বলল, 'তুমি অবুঝ হয়ো না আংটি, কোন অমিলই পৃথিবীতে গুরুতর নয়। সবচেয়ে বৃহত্তম, সর্বোত্তম হল মিল। সেই মিলনের পথে তুমি বাধা দিয়ো না। শুধু সেই পথেই সব ভুল মিলিয়ে যায়, সব দোষের শোধন হয়—'

আংটি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এটা থিয়েটার বাড়ি নয় খোকনদা, তুমি সেকথা ভুলে যাচ্ছ। বাবা ওঘরে রয়েছেন—'

কিন্তু ওঘর থেকে এঘরে আসতে নীরদবাবুর বেশি সময় লাগল না। তিনি এসে দোরের সামনে দাঁড়ালেন। ভেজানো দরজাটা সশব্দে ঠেলে দিয়ে ডাকলেন, 'প্রদোষ!'

প্রদোষ পিছন ফিরে তাকাল। খাটো ধুতি পরা খালি গা পৈতে গলায় দীর্ঘকায় এক শীর্ণ দেহ প্রৌঢ়। কিন্তু তাঁর স্বর যেন সিংহের। তাঁর দুই চোখে বাঘের হিংস্রতা। নীরদবাবু ফের কথা বললেন, অনুচ্চ চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'বেরিয়ে যাও।'

প্রদোষ বলল, 'আমি ক্ষমা চাইছি মেসোমশাই। আমি ওকে ভিক্ষা চাইছি।'

নীরদবাবু বললেন, 'আমি চাকর দারোয়ান ডাকি সেই সঙ্গে এটাও চাইছ নিশ্চয়ই।'

আংটি বলল, 'ছিঃ বাবা ওসব কি বলছ। তুমি যাও, তুমি তোমার ঘরে যাও।'

নীরদবাবু বললেন, 'আমি তো যাবই, আগে ওকে যেতে বল।'

আংটি বলল, 'তুমি চলে যাও খোকনদা, আজকের মতো চলে যাও।'

বলতে বলতে চোখে আঁচল চেপে নিজেই অন্য ঘরে চলে গেল আংটি।

প্রদোষের সেই বেরিয়ে আসাই শেষ আসা।

ইতিহাসের মতো ব্যক্তিগত জীবনেরও পুনরাবৃত্তি আছে। অভিজ্ঞতা প্রদোষকে কোন শিক্ষা দেয় নি, শুধু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধরে তার চারিদিকে আবর্তন করেছে। বছর খানেক বাদে ঠিক এইরকম কিংবা এর চেয়েও গুরুতর রকম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল প্রদোষকে হাতীবাগানে কুমুদবন্ধুবাবুর বাড়িতে। সেখানে সে স্বেচ্ছায় যায় নি, কি শিখাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে পাঠায় নি। তাঁরাই এক সন্ধ্যায় জরুরী দরকার আছে বলে গাড়ি পাঠিয়ে তাকে ডেকে নিয়েছিলেন।

অত বড় বাড়ির ছোট্ট একটা ঘর বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা। সে ঘরে শিখার বাবা ছিলেন, কাকা ছিলেন, দাদারা ছিলেন। প্রদোষ দাঁড়িয়ে ছিল আসামীর কাঠগড়ায়। বসবার আসন পর্যন্ত তাকে দেওয়া হয় নি।

কুমুদবাবু বললেন, 'শিখার একটি ভালো সম্বন্ধ এসেছে। ছেলে ব্যারিস্টার। বাপের জমিদারী আছে আমাদেরই রাজসাহীতে। ছেলেটি দেখতে শুনতে ভালো, বিদ্বান, বুদ্ধিমান। সবদিক থেকে আমাদের পাল্টা ঘর।'

প্রদোষ বলল, 'ভালোই তো।'

কুমুদবন্ধুর মেজ ভাই বিশ্ববন্ধু বললেন, 'কিন্তু শিখা তাকে বিয়ে করতে চাইছে না। শুধু তাকে কেন যত ভালো ভালো সম্বন্ধ আনছি সব সে বাতিল করে দিচ্ছে। তার ধনুর্ভঙ্গ পণ একজনকে ছাড়া সে কাউকে বিয়ে করবে না। তার নামও আমরা বের করেছি।'

প্রদোষ সব বুঝতে পেরেও বলে বসল, 'কে সে?'

শিখার সেজদার আর সহ্য হল না। সে দাঁতে দাঁতে পিষে গর্জন করে উঠল, 'কে সে? তুমি তাকে চেন না? সে এক হতভাগা বেআক্কেল গাধা। সে বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চায়। তার হাতখানা আমরা শুধু আজ মুচড়ে ভেঙে দেব। আর কিছু করব না।'

বলতে বলতে সমীরবন্ধু এগিয়ে আসছিল প্রদোষের দিকে, হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এল শিখা। বাইরে থেকে রুদ্ধ দরজায় ঘা দিতে দিতে বলল, 'সেজদা দরজা খোল, দরজা খোল শিগগির। আমি মাথা কুটে মরব। আমি এই তেতলা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে মরব।'

সমীরবন্ধু বলল, 'তাই তোর মরা উচিত।'

শিখা বলল, 'দরজা খোল। আমি তোমাদের সব কথায় রাজী আছি। আমি তোমাদের সব কথা শুনব।'

কুমুদবন্ধু বললেন, 'দরজা খুলে দাও সমীর।'

শিখাকে ঢুকতে দেওয়া হল ঘরে।

কুমুদবন্ধু বললেন, 'আমার পা ছুঁয়ে বল, শুনবি সব কথা।'

শিখা হাঁটু গেড়ে বসে বাপের জুতোয় হাত দিল, 'পা ছুঁয়ে বলছি।'

'বল ওর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবি নে।'

শিখা বলল, 'কোন সম্পর্ক রাখব না বাবা।'

কুমুদবন্ধু বললেন, 'তোকে এখনই বিয়ে করতে হবে না। কিন্তু

আমাদের রাজসাহীর বাড়িতে গিয়ে অন্তত তিনমাস থাকবি।'

শিখা বলল, 'তাই থাকব বাবা।'

সমীর বলল, 'এর কোন কথার যদি অন্যথা হয় ওকে আমরা আস্ত রাখব না। ঠুঁটো করে রাখব।'

শিখা বলল, 'যদি আমি কথা না রাখি তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কোরো, এখন ছেড়ে দাও।'

প্রদোষ ছাড়া পেয়ে চলে এল। ভাবল ফাঁড়া কাটল। সেই মুহূর্তে শিখাকে হারাবার দুঃখ তার হল না। অক্ষত দেহে প্রাণ নিয়ে যে ফিরে আসতে পেরেছে তাতেই খুশী হয়ে উঠল। কিন্তু লজ্জা পেল পরে। হোটেলে ফিরে এসে নিজের রূপকে দেখতে সে ভালবাসে। কিন্তু বড় দেয়াল আয়নাটার দিকে আজ সে তাকাতে পারল না, পিছন ফিরে রইল তার দিকে। আত্মগ্লানি আর ধিক্কারে তার মন ভরে উঠল। ছি ছি ছি, কি মুক্তিপণ দিয়ে সে বেরিয়ে এল। নিজেব সম্মান হারাল, পৌরুষ হারাল, শুধু তাই নয়, পরমতম প্রিয়াকেও হারিয়ে এল সে। প্রাণের চেয়ে প্রিয় কিছু নেই, এই নিষ্ঠুর বাস্তব সত্যকে সে স্বীকার করতে বাধ্য হল। কিন্তু পৃথিবীতে একজনকে ছাড়া প্রাণ অপ্রিয় হয়ে ওঠে, জীবন দুর্বহ হয় একথাও প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে লাগল।

দিন চারেক কাটল এমনি করে, চারদিন তো নয়, চারযুগ। কোথাও গিয়ে স্বস্তি নেই। নিজের ঘরখানা পর্যন্ত যেন অন্ধকার গহ্বর হয়ে উঠেছে। দিন যদি বা কাটে রাত কাটতে চায় না। রাত্রে মনে মনে সঙ্কল্প করে, ভোরে উঠে বুক ফুলিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে সেই হাতীবাগানের সিংহদ্বারে। বলবে, 'তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর আমি এখান থেকে নড়ব না। তাকে ছাড়া আমি যাব না এখান থেকে।'

কিন্তু দিনের রোদে তার এই অবাস্তব বীরত্বের স্বপ্ন শুকিয়ে যায়। ঘনিষ্ঠ দু-একজন বন্ধুও তাকে পরামর্শ দেয়, 'খবরদার ও ধরনের ছেলেমানুষি করো না। ঘরে বসে বসে যত খুশি তুলি দিয়ে সুভদ্রা কি সংযুক্তা হরণের চিত্র এঁকে যাও কিন্তু নিজে ওদিকে আর পা বাড়িয়ো না। তাতে শুধু তুমিই মরবে তা নয়, তাকেও সহমরণে টেনে নেবে।'

কিন্তু সুভদ্রা কি সংযুক্তাদের যে এ যুগেও অভাব নেই তার প্রমাণ দিল শিখা। পঞ্চম দিনে সেই নীলচে রঙের চিঠি এল ডাকে: আমরা রাজসাহী যাচ্ছি। পঞ্জিকায় ভালো যাত্রার দিন ছিল না বলে এক-দিন দেরি হল, রাত বারটায় নৈহাটি স্টেশনে নর্থ-বেঙ্গল গাড়ি দাঁড়াবে। আমার সঙ্গে বেশি লোকজন থাকবে না। মেজো কাকা অবশ্য থাকবেন সঙ্গে। মার যাওয়ার কথা ছিল, তিনি যেতে পারবেন না। আমি সেকেণ্ড ক্লাসের একটি মেয়ে গাড়িতে থাকবে। আর থাকবে আমাদের ঝি বাসনা। তাকে গয়না দিয়ে বশ করেছি। আমাদের পুরনো রামভজনও যাচ্ছে, সেও আমার সহায়। সিদ্ধি খাইয়ে মেজো কাকাকে সে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে। তুমি সময়মতো থেকো স্টেশনে। তারপর যদি সুবিধে হয়—। যদি সুবিধে হয় তখন কি করবে না করবে সে ভার তোমার ওপর। টাকার জন্যে ভেবো না, টাকা আমার সঙ্গে থাকবে, যথেষ্ট গয়নাও থাকবে গায়ে। তোমার মনে যদি তার অর্ধেক পরিমাণ জোরও থাকে তা হলে আর ভাবনা নেই।

অর্ধেক কেন, জোর যে পুরো মাত্রাতেই ছিল তার পরিচয় দিয়ে প্রদোষ ফিরতি ট্রেনে শিখাকে নিয়ে সেই রাত্রেই পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। শেষরাত্রে ধরেছিল পশ্চিমের গাড়ি। গ্রাম, গঞ্জ, খ্যাত-অখ্যাত, ছোট বড় শহর। তারপর এলাহাবাদের হোটেলে এক

খবরের কাগজে হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ স্তম্ভে চোখে পড়ল সুহাসিনীর অনুনয়, 'শিখা তোমরা ফিরে এস। আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের কোন অনিষ্ট হবে না।'

শিখা সেই বিজ্ঞপ্তি দেখে বলল, 'অনিষ্ট হয় যদি হোক। আর আমার ভয় কি, তোমার হাতের সিঁদুর তো সিঁথিতে পরে নিয়েছি।'

কলকাতায় এসে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে তারা অবশ্য সেই চোরাই সিঁদুরকে আইনসম্মত এবং কালীঘাটে গিয়ে ধর্মসম্মত করে নিয়েছিল। শিখার বাবা, কাকা আর দাদারা কোন বাধা দেন নি কিন্তু কোন সম্পর্কও রাখেন নি। প্রদোষের বাবাও সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন।

স্বজনরা গেলেও কয়েকজন বন্ধু রইল। তাদের সাহায্যে সহানুভূতিতে ফের এক গুণগ্রাহী সুহৃদের সমাজ গড়ে উঠল, বেড়ে উঠল আস্তে আস্তে।

থিয়েটারের চাকরি আগেই গিয়েছিল, কিন্তু সিনেমার চাকরি যোগাড় হল।

শিখা বলল, 'একি, তুমি ছবি না এঁকে ওই সব খেলাঘর বানাবে?'

প্রদোষ বলল, 'আমাদের নিজেদের ঘর শক্ত করার জন্যে কিছুদিন তা দরকার। তোমাকে সম্পদের মধ্যে না রাখতে পারি, কিন্তু না খাইয়ে রাখতেও পারব না শিখা।'

শুধু খাওয়ানো নয়, পরানো নয়, শিখার ক্যারিয়ারও তৈরি করে দিতে হবে। সে আরো শিখুক, আরো চর্চা করুক, নিজের শিল্প-সৃষ্টিতে সে আরো যশস্বিনী হোক। প্রদোষ তার জন্যে প্রাণপাত করবে। এক বড় শিল্পীকে গড়ে তুলবে সে। তা হবে প্রদোষের আরেক অনবদ্য সৃষ্টি। সে সৃষ্টি শুধু রঙের নয় রক্তের।

ভাড়া নিল বালিগঞ্জে একশ টাকার ফ্লাট। পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে শিখার জন্যে ট্রেনার রাখল প্রদোষ। লক্ষ্য রাখল, তার অশন-বসন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যাতে কোন অভাব না হয়। যে তার জন্যে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে এসেছে, প্রদোষ তার জন্যে সর্বস্ব তাগ করবে। সর্বস্ব মানে তার শিল্প।

শিখা মাঝে মাঝে অভিযোগ করত, 'কেবল কি চাকরি করলেই চলবে? তুমি ছবি আঁকছ না যে।'

প্রদোষ বলত, 'তুমি তো আমার ছবি।'

শিখা হেসে বলত, 'আমার ছবি তো তুমি এঁকে এঁকে ঘর ভরে টাঙিয়ে রাখছ। শেষে হয়তো একদিন দেখব আমার ছবিই আছে, আমার থাকবার আর জায়গা নেই। কিন্তু আমি সে কথা বলছি নে। তুমি অন্য কিছু আঁকছ না কেন, কেন নিজের ছবির একজিবিশন করছ না। আমি তো একা বড় হতে চাই নে। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে বড় হতে চাই। নইলে বড় হয়ে লাভ কি।'

প্রদোষের অর্থচিন্তা কমাবার জন্যে শিখা গীতায়তনে চাকরি নিল। সেখানে শুধু গীত নয় নৃত্যের চর্চাও হয়। শেখাবার ভার নিল শিখা। কে কার জন্যে বেশি ত্যাগ করবে এ যেন তার প্রতিযোগিতা। সে প্রতিযোগিতায় পুরুষের সঙ্গে মেয়ে পারবে কেন? ত্যাগের ভিতর দিয়ে ভোগ করতে শুরু করল প্রদোষ। মাসের মাইনে পেলে দামী দামী রঙ-বেরঙের জর্জেট আর বেনারসী সে কিনে নিয়ে আসে। কেটে কেটে নিজের হাতে শিখার ঘাঘরা তৈরি করে। কপটি তৈরি করে, ব্লাউজ তৈরি করে, সযত্নে বানিয়ে দেয় বক্ষবন্ধনী। উড়ুনি তৈরি করে নতুন ঢঙের নতুন রঙের। ঘুঙুরে আর রুপার নূপুরে ঘর ভরে গেল। প্রদোষ এ মাসে কেনা নূপুর ও মাসে শিখাকে পরতে দেবে না।

আসানসোল, জামসেদপুর, পাটনা, ভাগলপুর, দলের সঙ্গে যেখানেই নাচতে যাক শিখা প্রদোষ তার সঙ্গে যাবে। অনাহূত হয়ে নিজের অফিস কামাই করে, কাজের ক্ষতি করেও যাবে। অন্যের মেক-আপে শিখা নাচবে এতে প্রদোষের মন ওঠে না, ধার-করা ভাড়া-করা, এমন কি নিজের পুরনো পোশাক শিখা ব্যবহার করবে তাতে প্রদোষের ঘোর আপত্তি।

শিখা খুশী হয়ে বলে, 'তুমি কি শুরু করলে বল তো। আমার ভারি লজ্জা করে।'

প্রদোষ বলে, 'করুক। তোমার ভূষণ লজ্জা আর আমার ভূষণ নির্লজ্জতা। তুমি রূপশিখা আমি রঙের পতঙ্গ—পুড়ে মরা ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই।'

শিখা হেসে বলে, 'কিন্তু লোকে যে তোমাকে স্ত্রৈণ বলবে।'

প্রদোষ জবাব দেয়, 'বলুক। মেয়েদের সম্বন্ধে দুর্বলতাই পৌরুষের লক্ষণ। তোমাদের সম্বন্ধে যারা সবচেয়ে সবল তারা নিজেরা মেয়ে।'

কিন্তু আতিশয্য তাড়াতাড়ি শেষ হবার জন্যেই শুরু হয়। বন্যার পরে কাদাজল আর জোয়ারের পরে ভাঁটার টান—এ নিয়মের ব্যতিক্রম প্রদোষের বেলায়ও ঘটল না। যে অহংকার আর আত্মপরতায় শিখার আজ সর্বাঙ্গ মোড়া সে অঙ্গচ্ছদ তো প্রদোষ নিজেই তৈরি করে দিয়েছে। শিখার বদলে যদি আংটি আসত সে কি অন্যরকম হত? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রদোষ সোজা হয়ে উঠে বসল। যেন হঠাৎ বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগেছে। নিজের মনেই বলল, 'ছিঃ'।

স্টুডিওতে কারো আসবার লক্ষণ নেই। প্রদোষ শেষ সিগারেটটা নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়াল। আংটির স্কেচটা মুঠির মধ্যে পাকিয়ে পাকিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও ফেলল না। শেষ পর্যন্ত পকেটেই

ভরে নিল। হাতঘড়ি দেখল, নীলরতন চলে যাওয়ার পর মাত্র দশ মিনিট কেটেছে। পনের বছরের স্মৃতিসমুদ্র পার হতে কত অল্প সময় লাগল সে কথা ভেবে নিজের মনেই একটু হাসল প্রদোষ। পাশের ঘরে ফোন। সামনে দিয়ে যেতে যেতে একবার মনে হল, আংটিকে কি একবার ফোন করবে? রেডিওর স্টুডিওতে আছে কিনা খোঁজ নিয়ে কি দেখবে একবার? রঞ্জনা গাঙ্গুলীর তো প্রোগ্রাম থাকে মাঝে মাঝে। তা-ছাড়া অন্য কাজেও সে ওখানে যায়। কিন্তু ফোনটা তুলতে গিয়েও তুলল না প্রদোষ। কি হবে? কিইবা জিজ্ঞেস করবে সে ফোনে? শিখাকে বিয়ে করবার পর অনেকদিন পর্যন্ত আংটির সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। তারপর সুরসদনের আর এক বার্ষিক উৎসবে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে ফের দেখা হয়ে গেল আংটির সঙ্গে। নাচে সেদিন শিখার কোন অংশ ছিল না।

নিজেদের স্যুটিং থাকায় প্রদোষও কোন সাহায্য করতে পারে নি। একটু বেশি রাত্রে দর্শক হিসাবেই এসেছিল। গান শেষ হবার পর চেয়ারটা খালি দেখে আংটি এসে তাদের পাশেই বসল। বোধ হয় বসবার আগে লক্ষ্য করে নি। প্রথমে তিনজনেই আড়ষ্ট। তারপর শিখা বলল, 'তোমার গান চমৎকার লাগল আংটিদি। তোমার নাম আজকাল সকলের মুখে মুখে।'

আংটিও সহজ হতে চেষ্টা করল, একটু হেসে বলল, 'তোমরা তো মুখেও আন না। খোকনদা, বউ নিয়ে এসো না একদিন আমাদের ওখানে।'

শিখা বলল, 'তুমি আগে চল। তারপর আমরা যাব।'

নাগরিক শিষ্টাচার আর সৌজন্য বিনিময় মুখে মুখে চলল খানিকক্ষণ। জলসায় সভা-সমিতিতে কিংবা দুপক্ষেরই বন্ধু এমন কারো বাড়িতে

হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে এখনো সেই কুশল বিনিময় আর আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ চলে। এমনকি শিখার নাচের সঙ্গে আংটি গানও গেয়েছে কয়েকবার। কিন্তু কেউ কারো বাড়িতে আজ পর্যন্ত আসে নি। প্রদোষ যেতে পারে না। এখনও নীরদবাবু বেঁচে আছেন। অসুস্থতার জন্যে রিটায়ার করেছেন কয়েক বছর আগেই। বছরের বেশির ভাগ সময় বাতে শয্যাশায়ী হয়ে থাকেন। প্যারালিসিসের লক্ষণ নাকি দেখা দিয়েছে। আংটির ভাইরা বিয়ে করেছে, বোনরা বিয়ে করেছে। কিন্তু সে আজও বিয়ে করে নি। বাপের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও না। অনেক ভালো ভালো পাণিপ্রার্থীর আবেদন সত্ত্বেও না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে, 'এত দিন ভালো করে গান শেখার সুযোগ পাই নি। এবার পাচ্ছি, ইচ্ছে করে তা নষ্ট করব কেন।'

বিয়ে না করার যে কারণই থাক, না করে বুদ্ধিমতীর কাজই করেছে আংটি। আর্টিস্টকে বিয়ে করতে নেই, প্রদোষ মনে মনে ভাবল। এই কর্মহীন দুপুরে হঠাৎ প্রদোষের ইচ্ছা হল, বিপুল শহরের জনারণ্য থেকে আংটিকে সে খুঁজে বার করে। তার পর কয়েকটি মৌন মুহূর্ত তার সঙ্গে কাটায়। অনেক কথা বলেছে, এখন আর কথা নয়, ভালবাসার তরঙ্গভঙ্গে অনেক ডুবেছে ভেসেছে, এখন আর তাতে আগ্রহ নেই। এখন আংটিও তার কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না, প্রদোষও না। শুধু আশাহীন, প্রত্যাশাহীন, কয়েকটি নীরব ক্লান্ত মুহূর্ত তার সঙ্গে কাটাতে চায়। এ যেন অন্য মনে পথ চলতে চলতে অনেকদিন আগের ছেড়ে আসা পুরনো পাড়ায় পুরনো একটি বাসার সামনে হঠাৎ থেমে দাঁড়ানো। এ যেন অচেনা গ্রামের পুরনো এক ছায়াচ্ছন্ন মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে সব কিছু চেনাচেনা লাগাকে একটুকাল উপভোগ করা। আর কিছু না, তার চেয়ে আর বেশি কিছু নয়।

কিন্তু যশস্বিনী আংটিরই বা আজ সময় কই। সেও গান নিয়ে নিয়ত ব্যস্ত। রেডিয়ো, রেকর্ড, গানের স্কুল, ওস্তাদ আর অনুরক্তদের ভিড়ে তারও চারিদিকে ঘেরা নিশ্ছিদ্র দেয়াল। একজন সব পেয়ে যা হয়েছে, আর একজনের কিছু না পেয়েও তা হতে বাধে নি। আংটি যদি তার ঘরে আসত, সে যে শিখার মতই হত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সংস্কৃতি পরিষদের অনুষ্ঠানের দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল স্বামীর সঙ্গে শিখার বিরোধ যেন তত বেশি বেড়ে চলল। তার মুখে এক কথা, 'তুমি এই অবস্থায় নাচতে পারবে না।'

শিখা একদিন বলল, 'আচ্ছা, কেন তুমি অমন করছ বল তো। এই অবস্থায় আমার নাচতে যদি লজ্জা না হয়, তোমার লজ্জা কিসের।'

প্রদোষ বলল, 'লজ্জা অলজ্জার প্রশ্ন নয়, স্বাস্থ্যের প্রশ্ন।'

শিখা বলল, 'আমি ডাক্তারের কাছে শুনেছি কোন অসুবিধে নেই। তাছাড়া আমার শরীরের অবস্থা তোমার চেয়ে আমারই তো ভালো বোঝবার কথা।'

প্রদোষ বলল, 'ও আজ তোমার শরীর বুঝি শুধু তোমারই শরীর, আমার কিছু নয়। তুমি যে এমন অকৃতজ্ঞ হতে পারবে কোনদিন তা ভাবি নি শিখা।'

শিখা একটু নরম হল, একটু লজ্জিত হল। স্বামীর যত্নের কথা তার মনে পড়ল, শিল্পী প্রদোষের কথা মনে পড়ল। তার চোখে মুখে ঠোঁটে শুধু অজস্র চুম্বন চিহ্নই তো এঁকে দেয় নি প্রদোষ, মেক-আপের নানা রঙ নিয়ে নানা ধরন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। তার সুন্দর মুখকে কি করে আরো সুন্দরতর করে তুলবে সেই সাধনায় মগ্ন হয়ে রয়েছে প্রদোষ। তখন বরং শিখার মাঝে মাঝে লোভ জেগেছে, কিন্তু প্রদোষ ছিল নির্লোভ, নির্বিকার। শিখার মুখ যেন

প্রাণময়ী এক মানবীর মুখ নয়, যেন পটে-আঁকা মুখের আভাস। সেই আভাসকে রঙে রেখায় স্পষ্টতর করবার ব্রত নিয়েছিল প্রদোষ। তখন শিখার মুখ, শিখার দেহ, তার বিপুল কালো চুলের রাশ ছিল দুজনেরই শিল্পসৃষ্টির মাধ্যম। তার সেই চুলের মধ্যে মাঝে মাঝে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকত বটে প্রদোষ, কিন্তু সেই চুলে যখন বৌদ্ধ নারীর চুড়া তৈরি করত, কি বিরহিণীর বেণী তখন প্রদোষের আর-এক রূপ দেখা যেত, আর এক মুখ চোখে পড়ত। সে প্রদোষ শিল্পী প্রদোষ, হয়তো প্রণয়ী প্রদোষ—এখনকার মত শুধু স্বামী প্রদোষ নয়।

তখনকার দিনের সত্য এখনকার দিনে মিথ্যে হতে চলেছে। কারণ এখন প্রদোষ মস্ত বড় সিনেমা কোম্পানির নাম-করা আর্ট ডিরেক্টর। তার কাজের ক্ষেত্র আলাদা। এখন আর শিখার মেক-আপ করে দেবার সময় নেই প্রদোষের, সময় থাক তা শিখা চায়ও না। কিন্তু নিজের দেহ যে শিখার শিল্পসৃষ্টির একমাত্র অবলম্বন তা যেন প্রদোষ আজকাল ভুলে গেছে। তার দেহের মাধ্যমে এখন আর শিল্পসৃষ্টি নয়, শুধু সন্তান-সৃষ্টির দিকেই ঝোঁক প্রদোষের। প্রথমবারের মত দ্বিতীয়বারও যে স্বামীর অবিবেচনা আর অসতকতায় সন্তানের মা হতে যাচ্ছে শিখা সে দুঃখ সে কোনদিন ভুলতে পারবে না। তার জন্যে প্রদোষকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না শিখা। ডাঃ সোমের কাছে গোপনে গোপনে আবারও গিয়েছিল সে। তাঁর কথার ভাবে মনে হল এখন আর কিছু করবার নেই। অন্তত এই মুহূর্তে ঝুঁকি নেওয়া মোটেই ঠিক নয়। বিশেষ করে ফাংশনের দিন যখন এগিয়ে আসছে, এখন কিছু করতে গিয়ে যদি শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয় মাসখানেক, তাহলে এবারকার নাচটা, হয়তো এবারকার সীজনটা মাটি হবে। আবার যদি দেরি করে তাহলে হয়তো নির্বিবাদে আর একটি সন্তানের মা হওয়া ছাড়া আর

কোন উপায় থাকবে না। উপায় নেই। এখনই হয়তো আর কোন উপায় নেই। কিন্তু একটি সন্তান হওয়া যে কি তা প্রদোষ বুঝবে না, কোনদিনই বুঝবে না। তাতে যে শিখার শরীরের কতখানি যাবে, কত দীর্ঘ সময়ের জন্যে শিল্পসৃষ্টি থেকে অবসর নিয়ে বাড়িতে বসে থাকতে হবে তা বোঝবার সাধ্য প্রদোষের নেই।

তার এই সুন্দর তনু-দেহ তো শুধু প্রদোষের স্ত্রীর দেহ নয়, তার সন্তানের জননীর দেহ নয়, এ যে একজন শিল্পীরও দেহ, তার সৃষ্টির একমাত্র মাধ্যম। নিজের দেহের ফর্ম ঠিক রাখবার জন্যে কত যত্ন করতে হয় শিখাকে। পরিমিতভাবে খেয়ে, মেদবাহুল্যকে ঠেকিয়ে রাখতে হয়; সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত ব্যায়াম করে শরীরের গড়নকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে হয়। নিজের শরীর যদি ঠিক রাখতে না পারে তা হলে অনেক আগেই নাচের আসর থেকে তাকে অবসর নিতে হবে। অমনিতেই আংটির বহু আগে বিদায় নিতে হবে তাকে। সে তো আর গায়িকা নয় যে অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গেলেও শুধু কণ্ঠসর্বস্ব হয়ে থাকতে পারবে। সে তো আর লেখিকা কি চিত্রশিল্পী নয় দুটি চোখ আর একখানি হাত থাকলে বুড়ো বয়স পর্যন্ত নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। দুখানি পদপল্লবের ওপর এই যে লঘুভার লীলায়িত তনু-দেহ এর প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবিকৃতি আর দীর্ঘায়ুতা শিখার প্রয়োজন। এই সুন্দর দেহের মাধ্যমে আরো সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যে সে জন্মেছে। তাই সে বেঁচে আছে। তা যেদিন শেষ হবে সেদিন তার মৃত্যু। এই সাধারণ দেহ। তার চলার মধ্যে স্বাভাবিক ছন্দ আছে, মানুষের হাঁটা চলা কথা বলা অবশ্যই সহজ সৌন্দর্যময়। কিন্তু সেই সহজ সৌন্দর্যকে ঘনীভূত করার সাধনাই হল শিল্পসাধনা। সে সাধনা সহজ নয়, কঠিন। নাচের প্রত্যেকটি পদ্ধতি শিখতে, প্রত্যেকটি মুদ্রা আয়ত্ত

করতে দিনের পর দিন কি পরিশ্রম করতে হয়েছে তা শিখাই জানে। কিন্তু প্রদোষ যেন তা বুঝেও বুঝতে চায় না। তার কাছে একাধিক সন্তানের মা হওয়াই বড় কথা। তার সংসারের গৃহিণী হওয়াই বড় ধর্ম।

প্রদোষ বলে, 'দুদিন আগে হোক পরে হোক অবসর তো তোমাকে নিতেই হবে।'

শিখার মনে হয় প্রদোষের ভিতরের সেই স্বপ্নালু শিল্পী মরে গেছে। এখন আছে এক কাঠখোট্টা আর্ট-ডিরেক্টর। যে কাঠখড় নিয়ে পরের ফরমায়েস মতো খাটে। নইলে আর্টিস্ট কোনদিন অবসর নেবে একথা কি কেউ ভাবে? কেউ উচ্চারণ করে? মৃত্যুর সমুদ্রে বাস করেও কেউ কি মৃত্যুর কথা মনে রাখে।

শিখা জবাব দেয়, 'অবসর যদি নিই দুদিন পরেই নেব, আগে নেব কেন। তোমার মতো অত আগে নিশ্চয়ই নেব না। তোমার নিজের শিল্পের অকালমৃত্যু তুমি নিজে ডেকে এনেছ, এখন আমার মৃত্যুও তুমি চাও।'

প্রদোষ বিস্মিত হয়ে বলে, 'তোমার মৃত্যু!'

শিখা বলে, 'মানে আমার আর্টের মৃত্যু। একই কথা। আমিও যা আমার আর্টও তাই।'

প্রদোষ মাথা নাড়ে, 'না শিখা, না। তুমি আর তোমার আর্ট এক নয়। অন্তত আমার কাছে এক নয়। তোমার অসংখ্য ভক্ত দর্শকের কাছে তুমি শুধু আর্টিস্ট। কিন্তু আমার কাছে তা ছাড়াও তোমার আলাদা সত্তা আছে। তুমি আমার স্ত্রী, তুমি আমার সন্তানের মা। এমন দিন আসবে যখন আমি আর ছবি আঁকতে পারব না, তুমি আর নাচতে পারবে না, তাই বলে আমরা যে মরে যাব তা নয়। তখন

সংসার হবে আমাদের শিল্পের মাধ্যম, সন্তান হবে আমাদের সৃষ্টির মাধ্যম। আমরা শিল্পীই থাকব, শুধু আমাদের মিডিয়াম পালটাবে। সেই মিডিয়াম ব্যবহারের শিক্ষা এখন থেকেই নিতে হবে আমাদের।'

শিখা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। এ যেন তরুণ বয়সের সেই শিল্পী প্রদোষ নয়, প্রেমিক প্রদোষ নয়, শুধু গৃহস্বামী প্রদোষ। অকাল-প্রৌঢ়, জাতিচ্যুত, হৃতসর্বস্ব, স্মৃতিসর্বস্ব শিল্পী। যে স্বপ্ন দেখতে জানে না, যে স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে, যে তুলির মুখে স্বপ্নের রং ছড়িয়ে দিতে ভুলে গেছে।

শিখা অধীর হয়ে মাথা নাড়ে, 'না প্রদোষ না। দোহাই তোমার আমাকে আর বার বার মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দিয়ো না। আমি যতদিন নাচতে পারছি ততদিন তুমি শুধু নাচের কথা বল, আগের মত উৎসাহ দাও। আগের মত দৃঢ়বিশ্বাসে বল শিল্পের চেয়ে বড় কিছু নেই। তোমার জীবন-শিল্পের কথা আমি আরো পরে ভাবব, বুড়ো হয়ে ভাবব। যখন আর নাচতে পারব না তখন। এখন নয়, এখন নয়। এখন জীবন-শিল্প নয়, এখন শিল্পই আমার জীবন, শিল্পই আমার স্বামী, শিল্পই আমার সন্তান। আংটিদিই ঠিক করেছে, ঠিক বুঝেছে।'

শিখার নাচের দিন আরো এগিয়ে এল, আরো এগিয়ে এল। এলগিন রোডে এক ধনী ভক্তের বিরাট বাড়িতে নৃত্যশিল্পী শ্রীধর রাও এসে উঠেছেন। প্রবীণ প্রৌঢ় শিল্পী। প্রদোষের মতো সুপুরুষ নন। কিন্তু রূপসৃষ্টিতে অসাধারণ পুরুষ। গায়ের জোর, মনের জোর এখনও তাঁর যথেষ্ট। হবে না কেন, তিনি যে সার্থক শিল্পী, সিদ্ধশিল্পী। তাঁর ঘরে অনেকক্ষণ ধরে, সন্ধ্যার পর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত নাচের মহড়া চলে। শিখার উৎসাহের শেষ নেই, দেহে ক্লান্তি নেই। শহরের কত গুণী কত রসিকজন আসেন শ্রীধর রাওয়ের সঙ্গে আলাপ করতে।

নৃত্যশিল্প নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁদের আলোচনা চলে। ক্লাসিক্যাল ডান্স আর লোকনৃত্য, লোকনৃত্যের সম্ভাবনা, দুইয়ের সমন্বয়, সংমিশ্রণ সম্বন্ধে নানা মত আর নানা মতভেদের কথা ওঠে। শিখা উৎসুক দুটি চোখ মেলে উৎকর্ণ হয়ে শোনে। তার তরুণ পার্টনার দিব্যেন্দু সেন ফেরার পথে হেসে বলে, 'শিখাদি, মনে হচ্ছিল তুমি যেন ব্রতকথা শুনছ। আংটিদির একটা গোপন নাম আছে স্নিগ্ধা। তোমাকে নতুন নাম দিলাম মুগ্ধা।' শিখা হেসে দিব্যেন্দুর গাল টিপে দেয়, 'আমাকে আর তোমার নতুন নাম দিতে হবে না। খুব পেকে গেছ।'

'বাঃ রে, তাই বলে তুমি সকলের সামনে আমার গাল টিপবে না কি?'

'তবে কি নাক টিপব? তাতে যে দুধ বেরোবে।'

শ্রীমন্তবাবুর গাড়ি শিখাকে নিয়ে আসে, পৌঁছে দেয়। সে গাড়িতে শিখা দিব্যেন্দুকেও আনে, আনে তরুণ বয়সী মেক-আপ ম্যান শুভঙ্কর রায়কে। কোন কোন দিন তবলচী বেণু বাগচী আসে সঙ্গে। শিখার সান্নিধ্যে ওরা খুশী হয়। শিখাও আনন্দ পায়। নবযৌবনের উৎসাহ আছে ওদের মধ্যে, আছে নবজীবনের উত্তাপ। ওদের দেখলে সেই প্রথম দিনের প্রদোষের কথা মনে পড়ে, সেই প্রথম সন্ধ্যার কথা।

নাচের মহড়া হয় শ্রীধর রাওয়ের সঙ্গে। প্রথমে ঠিক ছিল তিনি বুদ্ধ অবতার করবেন। কিন্তু কয়েকদিন রিহার্সাল চলার পর মত পালটালেন, পালা পালটালেন। বললেন, 'না শিখা। সন্ন্যাস টন্ন্যাস থাক। তোমাদের এই বাংলা দেশ বুদ্ধির দেশ নয়, হৃদয়ের দেশ। বৈরাগ্যের দেশ নয়, অনুরাগের দেশ। এখানে আমি রসের পালা, রাসের পালা জমাব। আমরা করব রাসলীলা।'

শিখা বলে, 'বেশ, তাই করুন।'

শ্রীধর রাও নতুন করে পালা শিখিয়ে নতুন করে মহড়া আরম্ভ করেন। প্রত্যেকটি নাচ কম্পোজ করার সময় শিখার পরামর্শ নেন। তারপর সেই ভাবকল্পনাকে রূপ দেন অঙ্গভঙ্গীতে। ঘুঙুরের বোলে নূপুরের নিক্কণে হলঘরখানা ধ্বনিময় হয়ে ওঠে। প্রতিধ্বনি বাজে শিখার হৃদয়ে, 'কি আনন্দ! কি আনন্দ! কি আনন্দ! নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু, নাচে বন্ধু।'

মাঝে মাঝে শিখার লঘুভার দেহাধারখানি দুহাতে তুলে নেন শ্রীধর রাও। মুখের কাছে মুখ এগিয়ে আনেন। শিখা তাড়াতাড়ি শঙ্কিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কি দুহাতে মুখ ঢাকে। শ্রীধর রাও হো হো করে হেসে ওঠেন, 'ভয় নেই শিখা, ভয় নেই রাসেশ্বরী, এ চুম্বন নয়, চুম্বন-মুদ্রা।'

বাংলা দেশে মাঝে মাঝে থেকে বাংলা ভাষা চমৎকার আয়ত্ত করেছেন শ্রীধর রাও, বিয়েও করেছেন এক বাঙালী মেয়েকে। বাংলা তাঁর মাতৃভাষা না হলেও প্রিয় ভাষা, প্রিয়ার ভাষা।

ফেরার পথে গাড়িতে পাশে বসে যেতে যেতে দিব্যেন্দু বলে, 'শিখাদি সাবধান। বুড়োর শুধু মুদ্রা নয়, মুদ্রাদোষও আছে কিন্তু।'

শিখা হাসে, 'যুবাদের বেলায় দোষ নেই, দোষ বুঝি শুধু বুড়োদের বেলায়?'

দিব্যেন্দু হাসিমুখে বলে, 'কি জানি। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এবার প্রদোষদার কপাল মন্দ।'

শিখা স্মিতমুখে জবাব দেয়, 'প্রদোষদার চেয়ে তাঁর দিব্যেন্দু ভাইয়ের ভাবনাটাই যেন বেশি।'

প্রবীণ শিল্পীর মধ্যে নবযৌবনের আনন্দ, নব সৃষ্টির উন্মাদনা জেগেছে একথা মিথ্যা নয়। শিখা তা লক্ষ্য করেছে বই কি। এও টের পেয়েছে এই আনন্দের মূলে আছে শিখা নিজে। তার অনিন্দ্য রূপ, তার

পরিণত প্রগাঢ় যৌবন। শিল্পীর মনের রঙমহলে এক নিভৃত কক্ষে দীপ-শিখা জ্বলে উঠেছে, জ্বলছে সোনার আধারে ঘিয়ের প্রদীপ। শিখা যেমন দিব্যেন্দুর কাছ থেকে প্রেরণা পায়, শ্রীধর রাওও তেমনি প্রেরণা পাচ্ছেন তার কাছ থেকে, শিখা তা বুঝতে পারছে। শিখার মনে হয় তাতে দোষ কি। এই তো নিয়ম। চিরকালই যৌবনের কাছে জীবন ভিক্ষা করে নারী, জীবন ভিক্ষা করে পুরুষ। যেখান থেকে পার, যেমন করে পার রস আহরণ কর, আনন্দ আহরণ কর। তারপর সেই আনন্দরসে তোমার শিল্পের সোনার পাত্র কানায় কানায় ভরে তুলে ধর তোমার দর্শকদের সামনে, শ্রোতাদের সামনে, পাঠকদের সামনে—যারা একই সঙ্গে দেখে আর শোনে। এসব তো প্রদোষেরই কথা। আজকের প্রদোষ নয়, কালকের প্রদোষ। তাতে দোষ কি। শিল্পী তো চিরকাল থাকে না, তার জন্ম মৃত্যু আছে। কিন্তু তার বাণী অমর, তার সৃষ্টি অমর।

শিখার মনে হয় প্রদোষ যদি চিত্রশিল্পী না হয়ে নৃত্যশিল্পী হত, যদি শুধু শয্যাসঙ্গী না হয়ে শিখার নৃত্যসঙ্গীও হত তা হলে শিখা হয়ত তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত। দুজনে একসঙ্গে নাচত, দুজনে একসঙ্গে বাঁচত। কি মধুর হত সেই বাঁচা।

কিন্তু প্রদোষের জীবন থেকে মাধুর্য যেন একেবারে মুছে গেছে। অন্তত স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে তার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না তার চালচলনে কথায়বার্তায় শুধু রূঢ়তা, রুক্ষতা আর বিদ্বেষ ফুটে উঠে।

শিখা একদিন বলল, 'আচ্ছা, আমার সঙ্গে শত্রুতা করা ছাড়া তোমার কি আর কোন কাজ-কর্ম নেই ?

প্রদোষ বলল, 'ঠিক বলেছ, তোমার সঙ্গে আমার তো শত্রুতারই সম্পর্ক।'

শিখা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি বলি কি, তুমিও এস আমাদের সঙ্গে। সেখানে সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে। ভালোই লাগবে তোমার।'

প্রদোষ হেসে বলল, 'মহারানীর অসীম করুণা। কিন্তু তোমার তল্পি অনেক দিন বয়ে বেড়িয়েছি। আর নয়।'

শিখা আবার জ্বলে উঠল, 'তল্পি বয়ে বেড়ানো যাদের অভ্যাস তারা চিরজীবন তল্পিই বয়ে বেড়ায়। আমার তল্পি না বয়ে এখন সিনেমা স্টারদের তল্পি বইবে, এই তো?'

প্রদোষ ধৈর্য হারিয়ে বলল, 'স্পর্ধারও একটা সীমা আছে। তুমি সেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।'

শিখা বলল, 'আমার তো মনে হয় সীমাটা elastic, তা টানলেই বাড়ে। টানটা অবশ্য প্রাণের হওয়া চাই।' বলে শিখা একটু হাসল।

প্রেম শুধু এখন তাদের ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের বিষয়। আশ্লেষের পরিবর্তে শ্লেষ হয়েছে তাদের সম্বল। জীবন যে বেঁকে-চুরে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে প্রতিটি বক্রোক্তিতে তারা তার প্রমাণ দেয়।

কিন্তু বাইরের কেউ যখন আসে প্রদোষ আর শিখা তাড়াতাড়ি হাসি মুখের মুখোস পরে। দুজনেই সতর্ক, দুজনেই সচেষ্ট যাতে ধরা না পড়ে। তাদের দাম্পত্য প্রেমে যে ভাঁটার পালা চলেছে তা যেন কেউ টের না পায়।

দুজনেই দুজনের অভিনয় দেখে হাসে। আগে ছিল ভালবাসা এখন ভালবাসার অভিনয়। কিন্তু এই অভিনয়ের মধ্যে শিল্পসৃষ্টির আনন্দ নেই, আছে অনাসৃষ্টির নিষ্ঠুর উল্লাস। ছলনার মালিন্য আর প্রতারণার গ্লানি।

সেদিন শিখা সেজেগুজে তার নাচের পার্টনার দিব্যেন্দুর সঙ্গে যখন

রিহার্সাল দিতে বেরোল তাকে দেখে প্রদোষের মনেই হলো না যে তার জীবনে কোন অভাব আছে, কোন দুঃখ আছে। আনন্দের একটি রঙীন ঝরণার মত শিখা তরতর করে নিচে নেমে গেল।

প্রদোষ সেদিকে ঈর্ষাকুটিল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বার বার তার ইচ্ছা হতে লাগল শিখাকে বাধা দেয়। ওই ছুটন্ত ঝরণাকে স্তব্ধ করে ফেলে। কিন্তু নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে রাখল প্রদোষ। একটি কথাও উচ্চারণ করল না, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে একটি পাও নড়াল না, তাতে বাইরের লোকজনের কাছে নিজেদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। পর্দার আড়ালে যা ঘটে ঘটুক, বাইরে থেকে যেন কিছু না দেখা যায়, না শোনা যায়। তাতে শুধু নিজেরই নয় বাইরের আগন্তুক অভ্যাগতেরও সম্ভ্রমহানি।

অস্থির অশান্ত মন নিয়ে প্রদোষ নিজের ইজেলের কাছে গিয়ে বসল। কিন্তু বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না। কোন ধারণা নেই, কোন ভাবনা নেই, মন যেন শূন্য মরুভূমি। তুলি ধরবার ক্ষমতা তো দূরের কথা ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত গেছে।

প্রদোষ জামা কাপড় বদলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাইরে বেরোবার জন্যে তৈরী হল।

পদ্মা এসে সামনে দাঁড়াল, 'দাদাবাবু কখন ফিরবেন ?'

প্রদোষ বলল, 'কিছু ঠিক নেই।'

পদ্মা বলল, 'দিদিমণি এলে কি বলব ?'

প্রদোষ বলল, 'কিছু বলতে হবে না।'

রাস্তায় বেরিয়ে প্রদোষ মোড়ের মুখে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবল। এই মুহূর্তে সে কি করতে পারে। চিত্তরঞ্জনের জন্যে না হোক কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকবার মত অনেক ব্যবস্থাই আছে শহরে। কোন বারে

গিয়ে ঢুকতে পারে প্রদোষ, যেতে পারে বিশাখাদের ব্রীজের আড্ডায় কিংবা কোন সিনেমা হলে গিয়ে আড়াই ঘণ্টা কোন রকমে কাটিয়ে দিয়ে আসতে পারে। অবসর যাপনের আরো নানা বিকল্প একটু চেষ্টা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন কিছুই মনঃপূত হল না প্রদোষের। শুধু একজনের নাম, একজনের মুখ তার বার বার করে মনে পড়তে লাগল। প্রদোষের সেই প্রথম দেখা, প্রথম-ভালো-বাসা মেয়ে। যার প্রেম আর বিশ্বাসের মর্যাদা প্রদোষ বিন্দুমাত্র রাখে নি, নিষ্ঠুর আঘাতে টুকরো-টুকরো করে যার অনুরাগকে ধুলায় ছড়িয়েছে। আংটির জন্যে মনটা আকুল হয়ে উঠল প্রদোষের। তার সঙ্গে একবার দেখা করা চাই। অবশ্য অযাচিত ভাবে এই দেখা করার মধ্যে কোন গৌরব নেই। বরং হীনতা আছে। পৌরুষ আর আত্ম-সম্মান একেবারে ত্যাগ করতে না পারলে ফের আংটির কাছে গিয়ে দাঁড়ানো যায় না। এ কথা প্রদোষের মনে এসেও বেশিক্ষণ আমল পেল-না। কি হবে পৌরুষের গর্ব আর গৌরব দিয়ে। সে আজ আশ্রয় চায়, সান্ত্বনা চায়, আশ্বাস চায়। একজনের কাছে যদি তা না মেলে আর একজনের কাছে খুঁজে দেখতে দোষ কি।

সুরসদনের সঙ্গে আংটির যে এখনো যোগাযোগ আছে, সপ্তাহে দুদিন করে সেখানে যে সে গান শেখাতে যায় তা প্রদোষ জানত। একবার যাওয়ার পক্ষে আর একবার না যাওয়ার পক্ষে যুক্তি উপস্থিত করে প্রদোষ ট্রামে উঠে বসল। তারপর সুরসদনের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াল তখনও তার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে। যেন নতুন অভিসারে বেরিয়েছে প্রদোষ, জীবনে এই প্রথম একটি মেয়ের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। নানা বাধা বিঘ্ন আশঙ্কা ভয় চারদিকে যেন ওত পেতে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অভিসারের মধ্যে আছে অভিযানের দুঃসাহসিকতা

দু-একজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল প্রদোষের। তারা তাকে অভ্যর্থনা করে অফিস ঘরে নিয়ে বসাল। কিছুক্ষণ ধরে পারস্পরিক কুশল জিজ্ঞাসা চলল। তারপর একফাঁকে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করল আংটির কথা। হ্যাঁ, সে আছে। ক্লাশ নিচ্ছে। পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যেই বেরোবে।

কুড়ি মিনিটের চেয়ে আরো দশ মিনিট বেশি লাগল। তারপর বেরিয়ে এল আংটি। পিছনে আর আশেপাশে ছাত্রীর দল।

অফিস ঘরে তার জন্যে কে অপেক্ষা করছে শুনে আংটি দোরের সামনে এসে দাঁড়ালো। চেয়ার ছেড়ে প্রদোষও উঠে এল।

হঠাৎ কি কথা বলবে কেউ খুঁজে পেল না।

তারপর আংটিই প্রথমে কথা বলল, 'কি ব্যাপার ? তুমি এখানে ?'

প্রদোষ বলল, 'হ্যাঁ, একটা জরুরী কাজে এলাম। তুমি তো বেরোচ্ছ, চল যেতে যেতে কথাটা শেষ করব।'

আংটি একটু ইতস্তত করে বলল, 'আচ্ছা চল।'

রাস্তায় নেমে ছাত্রীদের বিদায় দিল আংটি, যারা বুদ্ধিমতী তারা নিজেরাই চলে যাওয়ার প্রস্তাব করল।

আংটিকে একটু নিরালায় পেয়ে প্রদোষ বলল, 'চল কোন পার্কে-টার্কে গিয়ে বসি, কি কোন রেস্টুরেন্টে।'

আংটি একটু হাসল, 'কথাটা কি অতই গোপন আর অতই জরুরী ? পার্কেরও দরকার নেই, রেস্টুরেন্টেরও দরকার নেই। তুমি এখানেই বল। রাস্তার ভিড়ই তো সবচেয়ে বেশি নির্জন জায়গা। এখানে কেউ তোমার কথায় কান দেবে না। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। যা বলবার এখানেই বলতে পার তুমি।'

প্রদোষ বলল, 'না আংটি এখানে নয়, অন্য কোথাও চল। আমি তোমার বেশি সময় নেব না। তাড়াতাড়িই ছেড়ে দেব।'

আংটি বলল, 'তোমার কথায় ভরসা পেলাম। কিন্তু, অন্য কোথাও যাওয়ার মত সময় তো এখন করে উঠতে পারব না। বাবার শরীরটা আরো খারাপ হয়ে পড়েছে, তাড়াতাড়িই ফিরতে হবে। তুমি বরং এক কাজ কর। আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এস। আমাদের বাড়িও খুব নির্জন আজকাল। আমি বাবা আর আমার এক বোন ছাড়া বাড়িতে কেউ থাকে না।'

হাতের ইশারায় একটা ট্যাক্সি ডাকল প্রদোষ। দুজনে উঠল গাড়িতে। প্রদোষ কিছু বলবার আগে ড্রাইভারকে আংটি তার বাড়ির ঠিকানা বলে দিল।

প্রদোষ বলল, 'বাড়িতে যেতে চাইছ যাও। কিন্তু আমাকে মাঝপথে নেমে যেতে হবে। তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত আমি যেতে পারব না।'

আংটি বলল, 'কেন ?'

প্রদোষ একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার বাবার সেদিনের সেই ব্যবহারের কথা তুমি ভুলে যেতে পার—আমি ভুলি নি।'

আংটি বলল, 'তোমার স্মরণশক্তি আমার চেয়ে সত্যিই প্রখর। কিন্তু সময় আর অবস্থা-ভেদে অনেক কিছুই বদলায়। বাবাও বদলে গেছেন। তুমিও কম বদলাও নি। অসুখে পড়বার পর অনেক আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবই এসে তাঁকে দেখে গেছেন। তিনি আশা করেছিলেন তুমিও একদিন আসবে।'

প্রদোষ বলল, 'কিন্তু তোমরা তো আমাকে কোন খবর দাও নি।'

আংটি জবাব দিল, 'লৌকিকতায় ত্রুটি হয়েছে তা স্বীকার করি। কিন্তু তুমিও কি বিনা খবরে একবার আসতে পারতে না আজ যেমন

এসেছ ?' একটু বাদে আংটি ফের বলল, 'আমি খুব নিষ্ঠুর, তাই না ?'

প্রদোষ বলল, 'না, নিষ্ঠুরতায় আমাকে ছাড়াতে পার নি।'

খানিক পরে চেতলার সেই গলির মোড়ে এসে গাড়ি থামল। প্রদোষ চলল আংটির পিছনে পিছনে। কোন রকম প্রতিবাদ প্রতিরোধের চেষ্টা করল না। যা ঘটবার ঘটুক। সব রকম অপমান সইবার জন্যে সে তৈরী হয়ে এসেছে।

বাড়িতে ঢুকে নীরদবাবুর ঘরের দিকে প্রদোষকে নিয়ে চলল আংটি।

প্রদোষ বলল, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

আংটি বলল, 'চল বাবার সঙ্গে একবার দেখা করবে।'

প্রদোষ বলল, 'কিন্তু তাঁর সঙ্গে ফের দেখা-সাক্ষাৎ করা কি আমার পক্ষে উচিত হবে আংটি ?'

আংটি মৃদু হেসে বলল, 'তুমি বুঝি সেই আগেকার কথা মনে করে রেখেছ ?'

প্রদোষ বলল, 'রাখাটা কি অস্বাভাবিক ? তোমার বাবা সেদিন যে অপমান করেছিলেন—'

আংটি বাধা দিয়ে বলল, 'ও কথা থাক। মানুষকে তার দু-একদিনের দু-একটি আচরণ দিয়ে বিচার করতে নেই। আরো আগের কথা ভেবে দেখ। আমাদের সেই ব্যারাকপুরের দিনগুলির কথা। তোমাকে কী ভালোই না বাসতেন তখন বাবা। এতদিনের সেই স্নেহ-ভালোবাসা কি একদিনের দু-একটা রূঢ় কথায় নষ্ট হয়ে যায় ?'

যতই যুক্তি দেখাক আংটি, নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা করবার মত মনের অবস্থা প্রদোষের ছিল না। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আংটির পিছনে পিছনে চলল।

দোরের কাছে এসে আংটি ডাকল 'বাবা।' নীরদ বাবু কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। বালিশ থেকে মাথা তুলে বললেন, 'ও আংটি! তোমার সঙ্গে কে এসেছেন?'

আংটি বলল, 'ব্যারাকপুরের খোকাদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বাবা।'

মুহূর্তকাল সবাই চুপ করে রইল। তারপর নীরদবাবুই ফের কথা বললেন, 'ও, প্রদোষ? এসো, ঘরে এসো।'

বাবার পরিচর্যা এবং ঘরসংসারের কাজকর্ম দেখবার জন্মে জ্ঞাতি সম্পর্কের একটি বোনকে বাসায় এনে রেখেছে আংটি। উনিশ কুড়ি বছর হবে বয়স। নাম শ্যামলী। লেখাপড়া সামান্য জানে। আংটি ভেবেছে সুযোগ সুবিধা মত শ্যামলীর বিয়ে সে নিজেই দিয়ে দেবে।

প্রদোষ নীরদবাবুর বিছানার পাশেই বসতে যাচ্ছিল, তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না ওখানে কেন। শ্যামলী তক্তপোশের তলা থেকে টুলটা এনে দাও না প্রদোষকে।'

নিচুমত একটা টুল এগিয়ে দিয়ে শ্যামলী বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

আংটি মেঝের উপর বসে বলল, 'জানো বাবা, খোকাদা তো প্রথমে আসতেই চায় না। যেমন লজ্জা তেমনি সংকোচ। আমিই জোর করে টেনে নিয়ে এলাম।'

কয়েক বছর আগে যেন তাদের মধ্যে কোন অসঙ্গত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। প্রদোষ যেন তুচ্ছ কারণে নেহাতই অভিমান করে দূরে সরে ছিল। নিজের চেষ্টায় ওর মান ভাঙাতে পেরেছে এমনি ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগল আংটি। প্রদোষ ভাবল প্রত্যেক মেয়েই কিছু না কিছু অভিনয় করতে পারে। ওরা জাত-অভিনেত্রী।

তারপর এক সময় নীরদ বাবুই আংটিকে তুলে দিলেন। বললেন,

'তুই যা আংটি, প্রদোষের জন্তে একটু চা-টা করে নিয়ে আয়।' শ্যামলীকেই তার জন্তে আংটি পাঠিয়েছিল। তার নিজের আর যাওয়ার দরকার ছিল না। কিন্তু আংটি বুঝতে পারল তার অসাক্ষাতে বাবা প্রদোষকে কিছু বলতে চান। সে তাঁকে সেই সুযোগ দেওয়ার জন্তেই উঠে গেল।

আংটির অনুমান ঠিকই। সে ভিতরের দিকে চলে গেলে নীরদবাবু প্রদোষের সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা আরম্ভ করলেন। বললেন, 'অসুখে পড়বার পর থেকে তোমাকে দেখবার জন্যে অনেকবার ইচ্ছা হয়েছে। আংটিকে বলেওছি তোমাকে খবর দিতে। কিন্তু ও বোধহয় সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারে নি।'

প্রদোষ এ কথার কোন জবাব না দিয়ে নীরদবাবুকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে দিল।

নীরদবাবু বলতে লাগলেন, 'সংকোচের অবশ্য কারণ ছিল। তোমার সঙ্গে আমি ভালো ব্যবহার করি নি। কিন্তু—'

প্রদোষ বাধা দিয়ে বলল, 'ওসব কথা এখন থাক মেসোমশাই। আপনি সুস্থ হয়ে নিন—।' নীরদবাবু বললেন, 'সুস্থ হবার আশা আর নেই বাবা। আবার কবে বলবার সুযোগ হবে জানি নে। কথাটা শেষ করতে দাও। অবশ্য এ কথা বলব না যে আমি অন্যায় করেছি। তোমাদের পক্ষে যা ক্ষতিকর হবে বলে বিশ্বাস করেছি আমি তাতে বাধা দিয়েছি। কিন্তু বাধা দেওয়ার ধরনটা অশোভন হয়েছিল। সেদিন আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারি নি।'

প্রদোষ আবার বলল, 'ওসব কথা আজ থাক।'

নীরদবাবু সে অনুরোধে কান না দিয়ে তাঁর আগের কথার জের টেনে বলতে লাগলেন, 'তোমার সঙ্গে আমার যতখানি আলাপ পরিচয়

যতখানি স্নেহ প্রীতির সম্পর্ক তাতে তোমাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিবৃত্ত করাই আমার উচিত ছিল। কিন্তু মনের তখনকার অবস্থায় আমি তা পারি নি। সেজন্য তোমার কাছে আমি—'

প্রদোষ বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার এসব কথায় আমি সেদিনকার চেয়েও বেশি দুঃখ পাচ্ছি।'

এরপর নীরদবাবু প্রদোষের পারিবারিক জীবনের কথা তুললেন। সে যে বিয়ে-থা করেছে, পুত্র সন্তান হয়েছে তার, এতে তিনি খুশী হয়েছেন। আর্ট-ডিরেক্টর হিসেবে প্রদোষের নাম-যশের কথাও তাঁর কানে গেছে। সবই আনন্দের কথা। প্রদোষ আরও কীর্তিমান হয়ে উঠুক, নীরদবাবু তাকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু বাপ-মাকে যেন দুঃখ না দেয় প্রদোষ। তাঁদের সঙ্গে বিরোধট এবার যেন সে মিটিয়ে ফেলে। প্রদোষ নিজেও তো সন্তানের বাপ হয়েছে ; সন্তান যে মানুষের জীবনে কতখানি স্থান জুড়ে থাকে তা তো অনুভব করবার শক্তি হয়েছে প্রদোষের। বাপ-মাকে সে যেন এবার একটু সুখে রাখবার চেষ্টা করে। কদিনইবা তাঁরা আছেন।

প্রদোষ বলল যে তার মার সঙ্গে কিছু যোগাযোগ সে রেখেছে। গোপনে গোপনে দেখা সাক্ষাৎও সে তাঁর সঙ্গে করে। কিন্তু বাবার স্নেহ সে আজও পায় নি। তবু সে আশা ছাড়ে নি। শেষদিন পর্যন্ত প্রদোষ চেষ্টা করে দেখবে। মেসোমশাইর উপদেশের কথা সে ভুলবে না।

প্রদোষের আজ মনে হল বাবা মার কাছে যেতে পারলে সে হয়ত সত্যিই শান্তি পেত। শিখা যদি তাঁদের স্নেহ কেড়ে নিতে পারত, সেবায় পরিচর্যায় তাঁদের সুখী করতে পারত তার চেয়ে বড় আনন্দের কিছু ছিল না। কিন্তু শিখার তা ইচ্ছা নয়। যে

পিতৃকুল ত্যাগ করে এসেছে—শুধু শ্বশুর শাশুড়ির স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকলে তার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হবে না। শুধু ক্ষুদ্র অখ্যাত একটি সুখের সংসার গড়ে তোলা তার ইচ্ছা নয়। খ্যাতি কীর্তি আর যশের মধ্যেই জীবনরস। নিজের শিল্পের জন্যে সে সুখও ছাড়তে পারে সংসারও ছাড়তে পারে। একবার কথা উঠেছিল নাচ যদি ছেড়ে দেয় শিখা তাহলে শ্বশুর শাশুড়ি তাকে হয়ত গ্রহণ করতেও পারেন। তখন এ প্রস্তাব প্রদোষেরই মনঃপূত হয় নি। আজ এতদিন বাদে ফের সে কথা তুললে শিখা হেসেই উড়িয়ে দেবে। বিবেচনার যোগ্য তো ভালো, শ্রবণযোগ্যও মনে করবে না।

প্রদোষের পারিবারিক প্রসঙ্গ শেষ করে নীরদবাবু এবার নিজেদের কথা তুললেন। বিশেষ করে নিজের মেয়ের কথা।

নীরদবাবু বললেন, 'আংটির জন্যে আমার ভারি চিন্তা হচ্ছে প্রদোষ।'

প্রদোষ বলল, 'কেন মেসোমশাই, চিন্তা কিসের। গায়িকা হিসেবে ওর তো আজকাল কত নাম-ডাক, কত সুখ্যাতি।'

নীরদবাবু বললেন, 'হ্যাঁ খ্যাতিও হচ্ছে, অর্থও হচ্ছে। কিন্তু জীবনে তাই কি সব? শুধু যশ আর অর্থে শান্তি নেই প্রদোষ। পুরুষের জীবন যদিবা ওসব নিয়ে কোনরকমে চলে যায়, মেয়েদের চলে না। মেয়েদের ঘর চাই, সংসার চাই, স্বামী চাই, সন্তান চাই।'

প্রদোষ মনে মনে বলল, না, চাই নে। অন্তত আর্টিস্টের তা চাওয়া উচিত নয়। আর্ট এমন এক উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ আর বাঁকা তলোয়ার যে সংসারের সোজা খাপে তাকে রাখা যায় না। রাখতে গেলেই বিভ্রাট বাঁধে। তাহলে হয় সে-সংসার বেঁকে-চুরে তার নিজস্ব আকার হারায়; আর তা না হলে খাপের সঙ্গে আপস করে চলতে চলতে তালোয়ারে মরচে পড়ে।

কিন্তু নিজের মনের কথা মুখে প্রকাশ করল না প্রদোষ। বরং উল্টো কথা বলল, 'হ্যাঁ, দেখে-শুনে আংটির এবার বিয়ে দেওয়াই দরকার।'

নীরদবাবু খুশী হয়ে বললেন, 'তুমিও সেই কথাই বলছ তো? আমি বলে বলে হার মেনে গেলাম। যতদিন আমি আছি ততদিন না হয় ওর এক রকম চলে যাবে। আমি একই সঙ্গে ওর বাপ, সন্তান আর বন্ধু। কিন্তু আমি তো অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে আসি নি, আমার যা শরীরের অবস্থা তাতে একদিন চোখ বুজলেই হল। তখন ওর কি হবে। আংটি বলে, তেমন দুর্দিনেও ও তার গান আর গানের স্কুল নিয়ে কাটিয়ে দেবে। গান ওর জীবনকে এমন ভাবে ভরে রেখেছে যে কোন কিছুতেই ওর নাকি আর দরকার নেই। গান ছাড়া আর সবই নাকি ওর কাছে বাহুল্য অবান্তর।"

প্রদোষ বলল, 'আপনি এসব কথা বিশ্বাস করেন?'

নীরদ বাবু বললেন, 'একেবারেই না। হয় ও নিজের মনকে আমার কাছে লুকাচ্ছে, না হয় তো ও নিজেই নিজেকে বুঝতে পারছে না। কিন্তু বুঝতে একদিন পারবে। তখন হয়তো ভুল শোধরাবার আর জো থাকবে না। শোধরাতে গিয়ে আরো বড় ভুল করে বসবে। আর তা যদি না করে নিজের শূন্যতা নিয়ে সারাজীবন হাহাকার করবে।'

ক্লান্ত হয়ে নীরদবাবু একটু থামলেন। অনেকদিন একটানা তিনি এত বেশি কথা বলেন নি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, 'ভালোই হল তোমার সঙ্গে ফের ওর দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। তুমি তো ছেলেবেলা থেকেই ওকে ভালোবাস। ওর যাতে কল্যাণ হয়, জীবনে ও যাতে সত্যিই সুখী হতে পারে তুমি সেই চেষ্টাই করবে, সেই পরামর্শই ওকে দেবে এ-বিশ্বাস আমার আছে প্রদোষ।'

মেয়ের ভবিষ্যতের জন্যে স্নেহব্যাকুল পিতার উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাকে

অন্তর দিয়ে অনুভব করল প্রদোষ। মুহূর্তের জন্যে নিজের দুঃখ ক্ষোভ অশান্তির কথা তার মনে রইল না। নীরদবাবুকে আশ্বস্ত করবার জন্যে একটু আবেগের সঙ্গেই সে বলে ফেলল, 'আশীর্বাদ করবেন, আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা যেন রাখতে পারি মেসোমশাই।'

চা আর খাবার নিয়ে আংটি ঘরে ঢুকল। এর আগেও দুবার সে দোরের কাছে এসে ফিরে গেছে। প্রদোষের কাছে এসব কথাই যে বাবা তুলবেন তা আংটি অনুমান করতে পেরেছিল। আংটি জানে ইদানিং তার বাবার এই এক মুদ্রাদোষ হয়েছে। আত্মীয় বন্ধু যাকে সামনে পাবেন তাঁর কাছেই আংটির বিয়ের প্রসঙ্গ তুলবেন। বিয়েতে আংটিকে রাজী করাবার জন্যে তাঁর সাহায্য চাইবেন। এ নিয়ে বাবার বিরুদ্ধে বহু অনুযোগ অভিযোগ করেছে, মান অভিমান এমনকি ঝগড়া করেও দেখেছে। কোন ফল হয় নি। আজকাল আংটি হাল ছেড়ে দিয়েছে। করুন ওঁর যা ইচ্ছে, বলুন ওঁর যা ইচ্ছে, আংটি তো আর অন্যের ইচ্ছেয় চলবে না।

চায়ের পাট শেষ হয়ে গেলে নীরদবাবু নিজেই মেয়েকে বললেন, 'আচ্ছা তোমরা বরং ওঘরে গিয়ে গল্পটল্প কর। আমি ততক্ষণ বইটা দেখি। মন্মথকে আবার তাড়াতাড়ি ফেরত দিতে হবে।'

মোটা ভারী বইখানা নীরদবাবু এবার তুলে নিলেন। প্রদোস আড়চোখে দেখল, বইখানার নাম ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস।

প্রদোষকে নিয়ে আংটি এবার কোণের ঘরে চলে এল।

আংটির গানের ঘর। মেঝেয় দামি কার্পেট বিছানো। তার ওপর বড় একটি তানপুরা সযত্নে রাখা হয়েছে। দেয়াল ঘেঁষে একটি সেলফ। সঙ্গীত-শাস্ত্রের বইয়ে বোঝাই। আর একপাশে ছোট একটি তক্তপোশ। বিছানাটি গুটিয়ে রেখেছে আংটি। টিপয়ের ওপর একটি সাদা চীনে

মাটির ফুলদানি। তাতে রজনীগন্ধা। আংটির খুব প্রিয় ফুল। একথা মনে পড়ল প্রদোষের।

আংটি নিজেই বারান্দা থেকে একটা বেতের চেয়ার টেনে আনল। প্রদোষের দিকে চেয়ে বলল, 'বোসো।'

নিজে বসল তক্তপোশে।

খানিকক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কাটল। যেন কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। যেন ভাষা ভাব প্রকাশের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

একটু বাদে আংটিই প্রথম কথা বলল, 'এতকাল বাদে হঠাৎ আমাদের সুরসদনে গিয়েছিলে কেন?'

ততক্ষণে প্রদোষ ভাবাবেগ সংবরণ করেছে। আংটি যদি এগিয়ে না আসে প্রদোষ নিজে যাবে না। নিজের হৃদয়কে উন্মোচিত করে ধরবে না তার কাছে। প্রদোষ যে ব্যর্থ, পরাজিত, অতৃপ্ত, বঞ্চিত সে কথা আংটিকে জানিয়ে আর কোন লাভ নেই। সমবেদনা সহানুভূতি আর অনুকম্পা ভিক্ষা করে কোন্ সান্ত্বনা মিলবে প্রদোষের। সে বরং চিরকাল উপবাসী থাকবে তবু ভিক্ষুক হবে না।

তাই ভাষায় যা প্রকাশ করল প্রদোষ ভঙ্গিতে তা ঢেকে দিল। আংটির কথার জবাবে লঘু তরল স্বরে বলল, 'গিয়েছিলাম সুরেশ্বরীর খোঁজে তা তো বুঝতেই পারছ।'

আংটি বলল, 'হ্যাঁ, তা বোঝা খুব কষ্টসাধ্য নয়, কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি।'

প্রদোষ বলল, 'যদি বলি উদ্দেশ্য সুরস্রোতে ভাসা।'

আংটি বলল, 'বিশ্বাস করব না।'

প্রদোষ বলল, 'কেন?'

আংটি বলল, 'কি জানি, তোমার ধরন-ধারন দেখে যেন মনে হয়,

তুমি ওজনে আজকাল বড়ই ভারী হয়ে পড়েছ। কোন স্রোতেই তুমি আজকাল আর ভেসে যেতে পার না।'

প্রদোষ বলল, 'দেখ, সুরস্রোতই হোক, তার জীবনস্রোতই হোক একটানা ভেসে যাওয়াটা বড় একঘেয়ে। তাই কখনো ডুবি কখনো ভাসি, কখনো কাঁদি কখনো হাসি।'

একটু চুপ করে থেকে আংটি জিজ্ঞাসা করল, 'শিখা কেমন আছে? ওকে নিয়ে এলে না যে?'

প্রদোষ সংক্ষেপে বলল, 'সে তার নাচের মহড়া নিয়ে ব্যস্ত। শ্রীমন্ত বাবুদের সংস্কৃতি সম্মেলনে নিমন্ত্রণ তুমিও তো পেয়েছ।'

আংটি বলল, 'তা পেয়েছি। যখন যা কিছু করেন আমাকে তিনি খবর দেন।'

প্রদোষ বলল, 'হ্যাঁ. মহিলা শিল্পীদের ওপর ওঁর একটু বিশেষ পক্ষপাত আছে।'

আংটি এবার হাসল, 'সে পক্ষপাত কারই বা কম। মহিলা শিল্পী বলে নয় শিল্পী বলেই আমি স্বীকৃতি পেতে চাই। যেখানে আমি শিল্পী সেখানে আমি পুরুষ না মেয়ে, সে কথা বলা অবান্তর। কিন্তু তোমরা পুরুষেরা সে কথা ভুলতে পার না।'

প্রদোষ বলল, 'একে যদি দোষ বল সে দোষ শুধু পুরুষেরই একচেটিয়া নয়। এ বৈশিষ্ট্য মেয়েদেরও আছে। তাদের চোখেও পৌরুষ একটা শিল্প, যেমন পুরুষের চোখে নারীত্ব। সেই পুরুষ কি নারীর মধ্যে যদি শিল্পগুণ থাকে তাহলে তা দ্বিগুণ হয়, এই মাত্র।'

আংটি বলল, 'তোমাদের শিল্প চোখে দেখার শিল্প, তাই বোধ হয় ওকথা বলছ। আমরা কানের ওপর নির্ভর করি। একটি মাত্র গুণই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সেই গুণ, সেই গুনগুনানি শুধু গানের।

দ্বিতীয় কি তৃতীয় গুণ আমাদের পক্ষে দরকার হয় না। বেশির ভাগ গুণী গায়ক কি গায়িকার দেখবে রূপ নেই। আমার মনে হয় এর একটা উদ্দেশ্য আছে। শ্রোতারা পাছে কানের কথা ভুলে গিয়ে চোখের দানও গ্রহণ করে সেই ভয়। যাঁরা সত্যিকারের রসিক তাঁরা কান দিয়ে সুরের রূপ দেখতে পান, সুরশিল্পীর চেহারার দিকে তাকাতে সময় পান না।'

প্রদোষ হেসে বলল, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে কানটা যেন প্রাণের গোপন খিড়কি দরজা, আর চোখদুটো বারোয়ারী সদর। আসলে সত্যিকারের রসিকের কাছে চোখও যা কানও তাই। তাদের মধ্যে রাতদিন দাম্পত্য কলহ লেগে নেই। আর্টিস্টের চোখে তারুণ্য যেমন সুন্দর বার্ধক্যও তেমনি। সে একই চোখে, একই সঙ্গে রূপ আর রূপাতীতকে দেখতে পায়।'

আংটি আস্তে আস্তে বলল, 'পেলেই ভালো।' একটু পরে বলল, 'কিন্তু স্বার্থপরের মত রূপ তুমি আজকাল শুধু একাই দেখছ, আর কাউকে দেখতে দিচ্ছ না। তোমার ছবি কোন একজিবিশনে পাঠিয়েছ এমন কথা বহুদিন শুনি নি।'

প্রদোষ বলল, 'কি করে শুনবে। আমি আমার মিডিয়াম পালটে ফেলেছি। তুলির কাজ তো আর করি নে, এখন আমার কাজ দেখতে হলে তোমাকে সিনেমায় যেতে হবে। কিন্তু সিনেমা বোধ হয় তুমি একেবারেই দেখ না।'

আংটি স্বীকার করে বলল, 'বেশী দেখি নে, মাঝে মাঝে দেখি। সময় পেয়ে উঠি নে।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল। তারপর প্রদোষ হঠাৎ বলল, 'কিন্তু আমার কথা যাক। তোমার কথা বল আংটি।'

নিজের নামটা এতক্ষণ পরে প্রদোষের মুখে উচ্চারিত হতে শুনে আংটি একটু চমকে উঠল। ভারি…পুরনো নামটা। বহুদূর থেকে বহুকালের পুরনো মন্দিরের মৃদু ঘণ্টাধ্বনির মত। পুরনো মিষ্টি আর বিষণ্ণ।

আংটি প্রদোষের দিকে একবার চেয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আমার কথা আর নতুন করে কি শুনবে। বলবার মত কিছু তো দেখছি নে।'

প্রদোষ বলল 'কিছুই দেখছ না?'

আংটি বলল 'না।'

প্রতিধ্বনিতে যেন শুধু শেষ শব্দটি উচ্চারণ করল।

একটু বাদে প্রদোষ বলল, 'তাহলে আমি বলি শোন। তুমি বিয়ে কর আংটি।'

আংটি একটু হাসল, 'আমি ভাবছিলাম কী কথাই না জানি তুমি বলবে! এ তো অনেক পুরনো কথা।'

প্রদোষ বলল, 'হোক পুরনো তবু তোমাকে শুনতে হবে।'

আংটি বলল, 'ও কথা অনেকবার শুনেছি। তবে তোমার মুখে নতুন লাগল বটে।'

প্রদোষ বলল, 'সব কথাই আসলে পুরনো আংটি। শুধু মুখের গুণে তা নতুন, শুধু কানের গুণে তার নবত্ব। কিন্তু তত্ত্বকথা থাক, তুমি বিয়ে কেন করবে না তাই বল।'

আংটি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এ কথার জবাব অনেকের কাছেই দিতে হয়। কিন্তু জবাব দিয়ে কাউকে খুশী করতে পারি নে। আমি বলি আমার আগ্রহ নেই। তারা ভাবে আমি তাদের সঙ্গে ছলনা করছি। যাদের আমি বন্ধু বলে কাছে ডাকি, সাধনার সঙ্গী হিসেবে

সহায়ক হিসেবে পেতে চাই তারা অন্য কিছু আশা করে। না পেয়ে কেউবা নিঃশব্দে চলে যায়, কেউবা গালাগাল দিয়ে কলঙ্ক রটিয়ে কান দুটো স্তব্ধ করে দেয়। কিন্তু আমার মধ্যে যা নেই, তা আমি ওদেরকে কি করে দেব? বলতে গেলে বানিয়ে বলতে হয়, দিতে গেলে দেওয়ার অভিনয় করতে হয়। আমি তা পারি নে।'

প্রদোষ মাথা নেড়ে বলল, 'এ তোমার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আংটি। এ আমি কিছুতেই মানি নে।'

আংটি বলল, 'না মানলে কি করব বল। হয়ত এ আমার সংস্কার। বামুনের মেয়ের রক্ষণশীলতা, হয়ত প্রকৃতি, হয়ত বিকৃতি। তুমি যা খুশি নাম দাও তাতে কিছু এসে যায় না। আমি যা আমি তাই। যা তুমি নানাজনের মধ্যে বার বার পেয়েছ, আমি যদি তা একবারের বেশি না পাই, না পেতে চাই, আমাকে তুমি দোষ দিতে পার না।'

প্রদোষ একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'দোষ দিই নে। কিন্তু বিশ্বাস করা শক্ত। হয়ত তুমি নিজেই নিজেকে বুঝতে পারছ না, হয়ত নিজেই নিজেকে আঁখি ঠারছ। আর সব কথা যদি ছেড়েও দিই, দেহের তো একটা দাবি আছে।'

আংটির মুখখানা মুহূর্তের জন্যে আরক্ত হয়ে উঠল। একটু বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রদোষের দিকে চেয়ে বলল, 'দেহের দাবি! হ্যাঁ তা তো আছেই। মনে কর সে দাবি মেটাবার বহু পথও আমার রয়েছে।'

আংটি একটু হাসল।

সে হাসি যে পরিহাস তা প্রদোষের বুঝতে বাকি রইল না, নরম মৃদু গলায় বলল, 'আমি তোমাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে ওকথা বলি নি আংটি, অপমান করার জন্যেও না।'

আংটি বলল, 'আমি তা জানি। তোমার নিজের যা বিশ্বাস, নিজে যা অনুভব কর তাই বলেছ। তার বাইরে তুমি যাবে কি করে। চল এবার ওঠা যাক, রাত হয়ে গেছে। ওদিকে তোমার ঘরনী বোধ হয় ভেবে ব্যাকুল হচ্ছে।'

প্রদোষকে আজও সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল আংটি। বিদায় নেওয়ার আগে আর একটি নীরব মুহূর্ত। প্রদোষ আশা করেছিল আংটি বলবে, 'আর একদিন এস।' কিন্তু তেমন কোন অনুরোধ তার মুখে শোনা গেল না।

প্রদোষ এবার নিজের থেকেই বলল, 'আমার কথাটা বোধহয় তোমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারি নি। তার জন্যে তোমার সঙ্গে আর একদিন দেখা হওয়া দরকার। তোমার কবে সময় হবে তাই বলো।'

আংটি বলল, 'শিগগির হবে বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া বেশি দেখা-সাক্ষাৎ আর ঠিকও নয়।'

প্রদোষ বলল 'কেন বল তো ?'

আংটি একটু ইতস্তত করে বলল, 'শিখা কষ্ট পাবে। তাকে তো আমি জানি। সে কষ্ট যে কি তা তো আমারও অজানা নেই।'

'আংটি !'

নামটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রদোষ হঠাৎ এগিয়ে এসে ওর হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিতে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দু-পা পিছিয়ে নিয়ে আংটি বলল, 'ছিঃ'।

প্রদোষ বলল, 'ছিঃ কেন।'

আংটি বলল, 'কতবার আর বিশ্বাস হারাবে। দেহের দাবি কি সম্মানের দাবির চেয়েও বড় ? আমি তা মনে করি নে।'

প্রদোষ আর কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে বিদায় নিল। আত্ম-গ্লানিতে মন ভরে উঠল তার। ছি ছি ছি। এমন কাঙালপনা সে কেন করতে গেল। এমন ভুল ফের কেন করে বসল? নিজেকে লাঞ্ছিত অপমানিত বিড়ম্বিত মনে হতে লাগল প্রদোষের। তার জীবনটা কি ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু নয়, একই ধরনের ঘটনার, একই ধরনের অঘটনের পুনরাবৃত্তি!

প্রদোষের মনে হল শিখার মত নিজস্ব ধরনে আংটিও নিষ্ঠুর। সেও পাষাণে গড়া, পাথরের স্তূপ। কি করে যেন একটি মাত্র ঝরণা তার ভিতর থেকে বেরিয়েছে—তার সুরের ঝরণা।

নাচের দিন তিনেক আগে একদিন অম্বিকা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গেল শিখা। হাসপাতালের কেবিনে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন তিনি। জরায়ুর জটিল ব্যাধিতে ভুগছেন। অপারেশন করাতে হবে। সেই প্রতীক্ষায় রয়েছেন। শিখা নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'কেমন আছেন দিদি?'

তিনি বললেন, 'ভালো। তোমাদের রিহার্সাল কেমন হচ্ছে?'

শিখা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'হচ্ছে একরকম। শ্রীমন্তবাবুরা অপেক্ষা করতে পারলেন না। নইলে আপনি নাচতেন, সেই ভালো হত।'

অম্বিকা রাও একটু হাসলেন, 'তুমি নাচলে আরো ভালো হবে শিখা।'

একটু যেন ঈর্ষার খোঁচা তাঁর কথায়।

শিখা বলল, 'আপনি আশীর্বাদ করলে ভালো হবে বই কি। সেই-জন্যেই তো প্রণাম করতে এলাম আপনাকে। যেন আপনার নাম রাখতে পারি। মান রাখতে পারি।'

অম্বিকা একটু নরম হলেন। খুশী হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই আশীর্বাদ

করি শিখা। আমি তোমার নাম শুনেছি। তোমার নিষ্ঠার কথাও শুনেছি। এখন তোমরাই তো ভবিষ্যৎ, আমার কর্ম আর কদিনই বা থাকবে। তা ছাড়া অপারেশনের পরে কি দশা হবে জানি নে। ফের গিয়ে আসরে দাঁড়াতে পারব কিনা তারই বা ঠিক কি। নিষ্ঠা তো আমারও ছিল। কিন্তু আর্ট বড় নিষ্ঠুর, বড় নিষ্ঠুর! তাকে জীবনের সর্বস্ব দিয়ো না শিখা। জীবনের সব ভার সে সইতে পারে না। দুখানি পা শুধু একটি দেহের ভারই সয়, তার চেয়ে বেশি নয়।'

শিখা তাঁকে প্রণাম জানিয়ে উঠে এল। মনে মনে মানল না তাঁর কথা, শিখার আশা অনেক, অনেক বেশি। সে তার পায়ের ভারবহন শক্তির কথা জানে। শুধু একটি দেহ কেন, তার আর্ট সব বইতে পারে, সব সইতে পারে। দেহ, মন, প্রাণ, জীবন-যৌবন—সব, সব। তার দয়িত সর্বেশ্বর, জীবনেশ্বর। তার শিল্পের ছোঁয়ায় এই বিপুল পৃথিবী, বিপুলতর প্রাণ আর বস্তুপুঞ্জ নিয়ে লঘুপক্ষ বিহঙ্গীর মত ওড়ে, নীলকণ্ঠী ময়ূরীর মত নাচে। শুধু পা নয়, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, শিল্পীর হৃদয় যখন নাচে তখন নাচে না কে, বাঁচে না কে?

হাজরা পার্কে সংস্কৃতি পরিষদের সপ্তাহব্যাপী সম্মেলন আরম্ভ হয়ে গেছে। হোক। গ্রাম থেকে, শহর থেকে অনেক গুণী এসেছেন। আসুন। মস্ত বড় প্যাণ্ডেলে এক উপনগর বসেছে। সংস্কৃতি-নগর। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য-নাটক শিল্পের বিভিন্ন ধারা সেই নগরকে স্নান করাচ্ছে। রসের পঞ্চনদ প্রবাহিত হচ্ছে তাদের শাখা প্রশাখা নিয়ে। সব কানে যাচ্ছে, সব শুনতে পাচ্ছে শিখা। কিন্তু সেখানে ছুটে যাচ্ছে না। সে তো ছুটে যাবে না, সে জ্বলে উঠবে। নিজের মহড়া নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে শিখা, নিজেকে নিখুঁত করার সাধনায় তন্ময় রয়েছে। খুঁতখুতি তারও যেমন, শ্রীধর রাওয়েরও তেমনি। এ ব্যাপারে কেউ কারো চেয়ে কম নয়।

তারপর এল সম্মেলনের শেষ দিন। শিখার নাচের দিন। ভোর বেলায় উঠে শিখা স্বামীকে হেসে বলল, 'আজ কিন্তু তোমার স্টুডিয়োতে গেলে চলবে না।'

প্রদোষ বলল, 'কেন ?'

শিখা বলল, 'আজ আমাদের প্রোগ্রাম।'

প্রদোষ বলল, 'কিন্তু তাতে তো আমার কিছু করবার নেই।'

শিখা বলল, 'আছে বইকি, আজ তোমার হাত থেকে আমি সেই প্রথম দিনের মত মেক-আপ নেব।'

প্রদোষ বলল, 'রাধারানীর অসীম দয়া। তোমাদের রাসলীলায় আমি তো আয়ান ঘোষ।'

শিখা হেসে বলল, 'বাবা, কি হিংশুটে তুমি। যাই বল তোমাকে যেতেই হবে। আংটিকে বলে দিয়েছি। সেও আসবে। তার গান দিয়েই শুরু করব আমরা—মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান—কেমন হবে বল তো ?'

প্রদোষ গম্ভীর ভাবে বলল, 'ভালোই হবে। কিন্তু আমি তো থাকতে পারব না। শিখা।'

শিখা বলল, 'কেন ?'

প্রদোষ বলল, 'আমাদের নতুন বই শুরু হয়ে গেছে। ফ্লোরে আজই সেট ফেলতে হবে। দশটায় বেরোব ফিরব রাত বারটায়। হয়ত তাও পারব না। বোধহয় সারা রাতই স্যুটিং চলবে। তুমি তো আগে আমাকে বল নি।'

'তুমি যে এত ব্যস্ত তাও কি বলেছ ?'

'বলব কাকে ? শোনার কি সময় ছিল তোমার ?'

শিখা বলল, 'ও, সেই ঈর্ষায় ফেটে মরছ তুমি ? সেই রাগে তুমি যাবে না ? নিজে নিবে গেছ তাই আমার সৌভাগ্য তোমার সইছে না।'

প্রদোষ বলল, 'চুপ কর শিখা, চুপ কর। আজকের দিনে অন্ততঃ ঝগড়া কোরো না। তাতে তোমারই ক্ষতি।'

শিখা বলল, 'আমার যা ক্ষতি করবার তুমি করেছ। সকালে উঠেই মুড নষ্ট করে দিলে। আজ যে কি হবে তা আমিই জানি।'

প্রদোষ বেরিয়ে যাচ্ছিল, শিখা অসহিষ্ণু হয়ে তার হাত টেনে ধরল, 'শোন, কোথায় যাচ্ছ ?'

প্রদোষ বলল, 'একখানা ব্লেড আনতে যাচ্ছি। মহা জ্বালা!'

শিখা বলল, 'আর জ্বালাব না। শুধু একটি কথার জবাব দিয়ে যাও। ব্লেড ফুরিয়ে যাবে না।'

প্রদোষ বলল, 'কি বলবে বল।'

শিখা বলল, 'তোমাকে যেতেই হবে। আমি বলছি তোমাকে যেতেই হবে।'

প্রদোষ অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল, 'তুমি ভুল করছ শিখা। আমি তোমার হুকুমের চাকর নই। বরং তুমিই আমার নিজের হাতের পুতুল। সেই পুতুলকে আমি মনের রঙে রাঙিয়েছিলাম। সে রঙ তুমি রাখতে দিলে না।'

শিখা বলল, 'আমাকে পুতুল বলছ, এতবড় স্পর্ধা তোমার। আমার নাচ তোমার নিজের হাতের পুতুলনাচ নয়, একথা জেনে রেখো। আমার নাচ শুধু আমারই, আমি শুধু আমারই আর কারো নই।'

প্রদোষ এসব কথার কোন জবাব না দিয়ে ব্লেড আনতে চলে গেল। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে শেভ করতে বসল।

শিখা অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে জ্বলল। তারপর ভাবল এ তো ভালো হচ্ছে না, এতে তো তার নিজেরই ক্ষতি হচ্ছে। আজ যে মনকে প্রসন্ন রাখা চাই, সরস রাখা চাই। নইলে যে সব মাটি। কিন্তু কোথায়

আছে সেই রসসিন্ধু? কার কাছে যাবে শিখা? কে মিটাবে তার অনন্ত পিপাসা? হঠাৎ চোখে পড়ল বিচ্ছুকে। একটু দূরে মেঝের ওপর বসে সে বাপের অনুকরণে রঙীন পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকছে। মাথায় কোঁকড়ানো তামাটে রঙের চুল। খালি গা।

শিখা বলল, 'কি করছ বিচ্ছু?'

বিচ্ছু ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে আঁকছি মা। দেখে দেখে আঁকছি।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল শিখা। প্রায় ছুটে গেল। খাতা পেনসিল-সুদ্ধ বিচ্ছুকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল, 'বিচ্ছু, আমার বিচ্ছু। আমাকে আদর কর, চুমু খা, চুমু খা।'

অনেক দিনের পর মায়ের আদর পেয়েছে বিচ্ছু। মায়ের মন টানতে পেরেছে। হাতের খাতা পেনসিল ফেলে দিয়ে সে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল, বলল—'কোথায় চুমু খাব মা।'

শিখা বলল, 'সব জায়গায়, সব জায়গায়। চোখে মুখে ঠোঁটে সব জায়গায়।'

মা আর ছেলের চুম্বন বৃষ্টি চলল কিছুক্ষণ ধরে, চুম্বন বিনিময় চলল।

ছেলেকে আদর করতে করতে হঠাৎ নিজের বাপ মায়ের কথা, দাদাদের কথা মনে পড়ল শিখার। বাড়ির একমাত্র মেয়ে, সবচেয়ে ছোট। এমন আদর সেও তো কত পেয়েছে। ব্যথায় ভরে উঠল বুক। দাদারা তারপর কেউ কেউ এসেছেন। বাবা মা আসেন নি। না এলেও নাচের উঁচু মঞ্চ থেকে তাঁদের মাঝে মাঝে দেখতে পেয়েছে শিখা। শ্রোতাদের ভিড়ে গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁরা এসে বসে রয়েছেন। শিখাকে দেখতে, তাঁদের যশস্বিনী মেয়েকে দেখতে।

যে যশের ভাগ তাঁরা পেয়েও পেলেন না। না কি এ শিখার নিজেরই মনের ভ্রম? সুদূর মঞ্চ থেকে দর্শকদের আসনে প্রত্যেক প্রৌঢ় আর প্রৌঢ়ার মুখে, বৃদ্ধ আর বৃদ্ধার মুখে সে নিজের বাপ মায়ের মুখ দেখেছে? এবার তাঁদের প্রত্যেকের নামে অলাদা করে নিজের হাতে লিখে কমপ্লিমেণ্টারি কার্ড পাঠিয়েছে শিখা। যদি আসেন—তাঁরা হয়তো আসতেও পারেন।

ছেলেকে বুকে করে তার মুখের দিকে তাকাল শিখা।

'আমাকে ভালবাসিস বিচ্ছু।'

'বাসি মা।'

'আমি তো তোকে তেমন আদর যত্ন করতে পারি নে। এবার থেকে করব। কাল তোকে অনেক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাব।'

'আজ তোমার নাচ শেষ হবে তাই না। কাল বেড়াতে নিয়ে যাবে, সত্যি?'

ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে দিল শিখা। হঠাৎ নিজের ভিতরে আর এক নতুন প্রাণস্পন্দন অনুভব করল। সূঁচের খোঁচায় তীব্র এক যন্ত্রণা বিঁধে রয়েছে যেন। এ যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচয় আছে শিখার। জীবন এমনি মৃত্যুযন্ত্রণার ভিতর দিয়েই আসে। সেবারও অনেক আগে থেকেই এমনি করে জানান দিয়েছে বিচ্ছু। হুল ফুটিয়ে দিয়েছে থেকে থেকে। নাচতে গিয়ে সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে এসেছে শিখার।

খানিকক্ষণ শিখা বিশ্রাম নিল। চুপ করে শুয়ে রইল বিছানায়। প্রদোষ ভাবল, অভিমান। কোন কথা না বলে খেয়ে-দেয়ে কাজে বেরিয়ে গেল। দুপুর কাটল, বিকেলের দিকে আবার খানিকটা সুস্থবোধ করল শিখা। একবার ভাবল ডাক্তারের কাছে যায়। কিন্তু তাকে সব বললে

তিনি আর তাঁকে নাচতে যেতে দেবেন না। অথচ শিখাকে আজ যেতেই হবে। তাকে নাচতেই হবে আজ। প্রদোষকে শিখা দেখিয়ে দেবে সে তার হাতের পুতুল নয়। তার সহযোগিতা, সমর্থন, তার প্রীতি, তার অনুরাগ না হলেও শিখার চলে।

শিখা তৈরী হতে লাগল। বাথরুমে ঢুকে স্নান সারল। নগ্ন সুন্দর দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিজের স্নেহদৃষ্টি বুলাল, সানুরাগে স্পর্শ করল নিজেকে। এ দেহ, এ সৌন্দর্য শুধু তার। দেহ তার, দেহভঙ্গির যে শিল্প সেও তার। কোন ভোক্তার প্রয়োজন নেই। সে নিজের আনন্দে নিজে নাচে, নিজের আনন্দে নিজে আছে। তার শিল্পে ফুল শুধু বিকশিত হয়েই খুশী। তা কোন মৌমাছির অপেক্ষা রাখে না। যারা মধু নিতে এসে কেবল হুল ফুটিয়ে যায় তাদের উপেক্ষা করাই সঙ্গত।

তৈরী হতে লাগল শিখা। দামী শাড়ি পরল। সব চেয়ে বর্ণাঢ্য শাড়ি। প্রাথমিক মেক-আপটা নিজের হাতেই কিছু করে নিচ্ছে। নীচে হর্ন বেজে উঠল। শ্যামের বাঁশী বেজে উঠেছে। একটু তাড়া-তাড়িই এসে পড়েছেন শ্রীধর রাও, শ্রীমন্তবাবুর দল। এই রীতি শ্রীধর রাওয়ের। একঘণ্টা, হয়তো দুঘণ্টা আগে তিনি স্টেজে যান। সব ঠিক-ঠাক আছে কি না খুঁটে খুঁটে দেখেশুনে নেন। মেক-আপটা পুরোপুরি না সেরে রঙিন অঙ্গাবরণ জড়িয়ে নিচে নেমে এল শিখা। মধুর লাস্যে হেসে বলল, 'চলুন, উপরে চলুন।'

শ্রীধর রাও স্মিত মুখে বললেন, 'উঁহু রাইকিশোরী, অত দেরি সইবে না। তোমার শ্রীকৃষ্ণের বয়স গেছে, ধৈর্য গেছে। মান ভাঙাবার পালা শেষ হতে না হতে বাঁশী ভাঙবার পালা এল বলে। তাড়াতাড়ি চলে এস শিখা।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল শিখা। একটি আনন্দের ঝরণা, রূপের ঝরণা

গতি বদলে উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। ঝরণা তো নিচে নামে, ধারা তো নিচে বয়। কিন্তু মানুষের আনন্দের ধারা আলাদা। তার ওপর নিচ নেই, দিক দেশ নেই। সে আনন্দ পৃথিবীর স্বর্গরাজ্যকে আকাশে নিয়ে যায়, আকাশের স্বর্গকে পৃথিবীতে আনে। শ্রীধর রাও ভাবলেন মনে মনে।

এবার তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিল শিখা। পদ্মাকে ডেকে বলল, 'সব দেখিস। বিচ্ছুকে ভুলিয়ে রাখিস একটু, আমি চললাম।'

কিন্তু চললাম বললেই কি চলা যায়। কোত্থেকে ছুটে এল বিচ্ছু। ধুলো-মাখা হাতে জড়িয়ে ধরল, 'আমি যাব মা। আমি তোমার নাচ দেখব।'

রাগ করতে যাচ্ছিল শিখা, পারল না। হেসে ছেলেকে ফের কোলে তুলে নিল। মেক-আপ নষ্ট হওয়ার ভয় রইল না মনে। হেসে বলল, 'দুষ্টু, তুমি বড় হয়ে দেখ।'

বিচ্ছু বলল, 'আমি তো বড় হয়েছি মা। ঢের বড় হয়েছি।'

'তাই নাকি?' গভীর আবেগে ছেলেকে চুমু খেল শিখা। অধরের উৎসমুখ দিয়ে বাৎসল্যের রস উপচে পড়ল। লিপস্টিকের রঙ লাগল বিচ্ছুর দুই ঠোঁটে।

শিখা বলল, 'তুমি আর একটু পরে যেয়ো। তোমার বাবার সঙ্গে যেয়ো সোনা।'

নিজের কোল থেকে বিচ্ছুকে পদ্মার কোলে তুলে দিল শিখা। তার-পর ফের নিচে নেমে এল। এমন তো কোনদিন হয় না। নাচতে যাওয়ার সময় ছেলে যদি এসে বাধা দেয় শিখা তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। জোর করে তাকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু আজ তার একি হল, মধুর বাৎসল্যরসে মন তার কানায় কানায় ভরে উঠল যে। বাপকে চটিয়েছে, ছেলেকে চটাবে না—একি সেই বুদ্ধিতে? রসসৃষ্টির জন্যে

নিজের মনকে প্রসন্ন আর সরস রাখা চাই সেই যুক্তিতে? শিখার মন বলল, না না এ তো যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়। এ তার সহজ মাতৃত্ব, সহজ সৌন্দর্য, সহজ আনন্দ। শিশু নিজেই এক শিল্প।

শিখা মনে মনে ভাবল, আজ এ কি হল তার? যশোদার মন নিয়ে, যশোদার হৃদয় নিয়ে দেবকীর মতো আর এক শ্রীকৃষ্ণকে গর্ভে ধরে সে শ্রীরাধিকার ভূমিকায় নাচতে যাচ্ছে। সে কি পারবে, সে কি পারবে?

গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াতে শ্রীধর রাও সাগ্রহে নিজের হাতে দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'এসো রাইকিশোরী, আমার পাশে এসে বস।'

শিখার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল, বলল, 'আমি বরং সামনের সীটে বসি।'

ম্লান ছায়া পড়ল শ্রীধর রাওয়ের মুখে। এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। নিঃশব্দে পরিপাক করে নিলেন অপমান। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তোমার যেখানে খুশি বস শিখা। শুধু একটা কথা মনে রেখ, আমার দেহের যা বয়স তাতে তুমি আমার মেয়ের মতো। আর আমার মনের বয়সের তুলনায় তুমি আমার নাতনী। কি নাতনীর চেয়েও ছোট। নাতনীর নাতনী। আমি সেই মন নিয়ে তোমার সঙ্গে রঙ্গরস করে নিজের মনে রঙ মাখিয়ে নিই। তার চেয়ে এক তিল বেশি নিতে আমার লোভ নেই।'

শিখা তাড়াতাড়ি উঠে গেল গাড়ির মধ্যে। নীচু হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল। অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ নেবেন না।'

তাঁর পাশে গিয়ে বসল শিখা।

শ্রীধর রাও বলতে লাগলেন, 'তোমার অপরাধ হয় নি শিখা। শান্ত হয়ে বস।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'রাধার কোন অপরাধ হয় না।

King can do no wrong-এর মতো রসের রাজ্যে Queen can do no wrong.'

তারপর সেই আগের বিবাদ-গম্ভীর সুরে বলতে লাগলেন, 'এখানে আসবার আগে অম্বিকার সঙ্গে দেখা করে এলাম। শান্ত করে এলাম, সব কথা বুঝিয়ে বলে এলাম তাকে। সে আমার স্ত্রী, সে আমার শুধু জীবনসঙ্গিনী নয়, শিল্পীজীবনের চিরসঙ্গিনী। সেই অম্বিকা আজ অসুস্থ। তবু আমি শ্রীমন্তবাবুদের সঙ্গে কনট্রাক্ট করেছি, তোমার সঙ্গে কনট্রাক্ট করেছি। এতে নানা জনে নানা কথা বলছে। অনেক কথা অম্বিকার নিজেরও মনে হয়েছে। সব তার ভুল। আমি তো শুধু স্বামী নই, আমি যে শিল্পী। আমি যে স্রষ্টা। আমি শুধু গৃহস্থ হয়ে থাকতে পারব কেন। আমাকে যে বার বার মঞ্চস্থ হতে হয়। সৃষ্টির যে তাগিদ আমি নিজের মধ্যে অনুভব করি, তা ডাক্তারের অসুখ-বিসুখ মানে না, নীতিবিদের কল্যাণ-অকল্যাণ মানে না, হিত-বাদীর সুখ-শান্তি মানে না তা বন্যার মতো সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।'

শিখা বলল, 'কিন্তু কল্যাণকেই যদি ভাসায়, জীবনকেই যদি নাশ করে সে শিল্পের মূল্য কি।'

শ্রীধর রাও বললেন, 'নাশ করে না শিখা, নাশ করে না। ওটা নীতিবিদদের মনের ভ্রম। মানুষের কল্যাণবোধ তার সত্তার সঙ্গে জড়ানো। তাই তা তার সৃষ্টির সঙ্গে জড়ানো। তোমার আমার সাধ্য কি যে সেই গিঁট খুলি। তবু গিঁট খোলবার ভান করি। ভক্ত যখন অভিমান করে মাকে বলে, 'তোমায় মা বলে আর ডাকব না মা,' তখন সত্যিকারে মা রাগ করেন না, হাসেন। কিন্তু মামারা আসেন, মামীরা আসেন শাসন করতে। চোখ রাঙিয়ে মুখ চেপে ধরে বলেন, 'ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলতে নেই, ওকথা বলতে নেই।' তারা ভক্তের

ভাষা বোঝে না মা, ভক্তের ভাষা বোঝে না।' বলে সস্নেহে শিখাকে এবার কাছে টেনে নিলেন শ্রীধর রাও।

শিখা তাঁর দিকে চেয়ে অভিভূত হয়ে রইল।

তারপর হাজরা পার্ক, তারপর রূপমঞ্চ। সঙ্গে সঙ্গে বেশ পালটে গেল, রূপ পালটে গেল, ভাষা, ভূষণ, ভঙ্গি পালটে গেল শ্রীধর রাওয়ের। নিজের মেক-আপ নিজেই নিলেন তিনি। কে বলবে তাঁকে প্রৌঢ়? কে বলবে তাঁকে প্রবীণ? শিখা দেখল সেই চিরকিশোর নটবর শ্যাম। মেক-আপ ম্যানকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজে এগিয়ে এলেন, 'আমি তোমাকে সাজিয়ে দেব শিখা।'

শিখা হেসে বলল, 'আপনি পারবেন?'

তিনি বললেন, 'দেখ না পারি কি না পারি।'

শ্যাম নিজের হাতে সাজাতে লাগলেন তাঁর রাধাকে। নিজের চোখে, মুখে, কপালে, ঠোঁটে, বুকের কাঁচুলিতে বার বার তাঁর স্পর্শ অনুভব করল শিখা। মাঝে মাঝে চোখ বুজে মনে মনে বলল, প্রদোষ, বড় আশা করেছিলাম, আজ আমার এই সৌভাগ্যের দিনে তোমার মেক-আপ নিয়ে আমি নামব। তা হল না, সে ভাগ্য আমার হল না। কিন্তু আমি তোমার মেক-আপই নিচ্ছি। তোমার স্পর্শই নিচ্ছি। যে-কোন শিল্পীর মধ্যে তুমি আছ। সব শিল্পের মূল কথা এক, সব শিল্পীর মর্মকথা এক।

রঙিন পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অপেক্ষমান দর্শকদের। মণ্ডপ ভরে গেছে, প্রত্যেকটি আসন পূর্ণ। প্রত্যেকটি হৃদয় পূর্ণ হওয়ার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। এই প্রতীক্ষা কি মেটাতে পারবে শিখা? প্রত্যক্ষ করাতে পারবে রসরূপিনী শ্রীরাধাকে।

কিন্তু আংটি এল না যে। তার গান দিয়েই যে উদ্‌বোধন হবে।

শ্রীমন্তবাবু খুঁজে নিয়ে এলেন তাঁকে। এসেছে অনেক আগেই। অভিমান করে বসে আছে দর্শকদের সারিতে। শ্রীধর রাওয়ের কাছ থেকে সে যোগ্য সমাদর পায় নি। আজ রাসেশ্বরী শিখা, আংটি শুধু তার পার্শ্বচারিণী সখী। শুধু কি আজ। সারা জীবনই তো তাই হয়ে রইল। আংটি আজ আসত না। নিতান্তই শিখা আর শ্রীমন্তদার পীড়াপীড়িতে, অনুরোধে উপরোধে এসেছে। তার নিজের প্রোগ্রাম গেছে কাল। কালও প্যাণ্ডেল এমনি পূর্ণ ছিল, এমনি ফেটে পড়েছিল। এমন কি, এর চেয়েও বেশি। তার সঙ্গীতের সুধাবৃষ্টিতে শ্রুতিময় হয়ে বসেছিল সবাই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসধারায় সবাইকে সে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সুর আর বাণীর গঙ্গা-যমুনা প্রবাহিত হয়েছে হৃদয়ে হৃদয়ে। অনুরাগীদের আলোচনায়, সেই কলধ্বনি আজও এসে শুনতে পাচ্ছে আংটি। আজ তার আসবার দরকার ছিল না। শুধু শিখার অনুরোধে—একটিমাত্র গান গাইবে। পাছে শিখা ভাবে, পাছে কেউ মনে করে সে পরশ্রীকাতর। কেন কাতর হবে সে? শ্রীর কি তার অভাব আছে? নিজের ক্ষেত্রে সেও যশস্বিনী। বিত্ত প্রতিপত্তি যা সে চায় তার চেয়ে অনেক বেশিই পেয়েছে। তবু হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা সে অন্যকে দেখাতে যাবে কেন? তাই আংটি এসেছে।

শ্রীমন্তবাবু তার হাত ধরে নিয়ে গেলেন। দরকার হলে তিনি পা ধরতেও পারেন। শ্রীমন্তবাবু বললেন, 'শিখা ডাকছে তোমাকে।'

আংটি পর্দার আড়ালে শিখার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'খোকনদা আসে নি?'

শিখা বলল, 'না তার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছি। সে আজ আসবে না।'

আংটি মৃদু হাসল। দাম্পত্য কলহের তুচ্ছ মান-অভিমানের খেলা সে বোঝে না। বোঝবার কোন আগ্রহও তার নেই।

শিখা হঠাৎ বলল, 'আমার আজ বড় ভয় করছে আংটিদি।'

আংটি নির্মম ভঙ্গিতে ফের একটু হাসল, 'কেন, ঝগড়া করে এসেছ বলে ?'

শিখা বলল 'না, সে জন্যে নয়। ভাবছি আমি কি পারব ?'

আংটি বলল, 'না পারবার কি আছে।'

শিখা বলল, 'অনেক কথা আছে আংটিদি। জানো তো আর্টিস্টরা বড় স্বার্থপর। তাদের ভাই নেই, বন্ধু নেই, প্রেমিকা নেই। তোমাদের গানের বেলায় দেখেছি তবলচী ওস্তাদ গায়ককে কোথায় মারবে তার জন্যে ওত পেতে থাকে। গায়ক সেই ফাঁদ এড়িয়ে আবার ফাঁদ পাতে। আমাদের নাচের বেলায়ও তাই। রঙ্গমঞ্চে যে তোমার প্রেমিক তারও সতর্ক দৃষ্টি তুমি যেন তাকে ছাড়িয়ে না যাও। দর্শকদের চোখ যেন শুধু তার ওপরেই থাকে। সব সময় সতর্ক দৃষ্টি সে যেন আমাকে ছাড়িয়ে না যায়। দর্শকের চোখ যেন শুধু আমার ওপরই থাকে। শ্রীধর রাও পর্দার আড়ালে যতই আমাকে রাধা রাধা ডাকুন না, স্টেজে নামলে তিনি কি আমাকে দাঁড়াতে দেবেন ?'

আংটি বলল, 'না দিলে তিনিও দাঁড়াতে পারবেন না। তিনি পড়ে মরবেন। অতবড় আর্টিস্ট, টিম-ওয়ার্ক কি তিনি না মেনে পারেন ? যে কম্পিটিশনের কথা তুমি বললে শিখা তা অবুঝ স্বামী-স্ত্রীর দম্পত্য কলহ। তা বেশিক্ষণ থাকে না। তাদের মিলতে দেরি হয় না। সেজন্য ভেব না।'

শিখা বলল, 'আরো এক কারণে ভয় হচ্ছে। আজ প্রদোষ এল না। বাবা-মা-দাদাদের কার্ড পাঠিয়েছিলাম তাঁরাও এলেন না কেউ। খবর পেলাম তাঁরা এখন কেউ নেই কলকাতায়। হঠাৎ মনে হচ্ছে আমার

যেন কেউ নেই, আংটিদি কেউ নেই।' আংটির হাত চেপে ধরল শিখা। কিসের আবেগে বুকের ভিতরটা হঠাৎ দুলে উঠল আংটির, কেঁপে উঠল সর্বাঙ্গ। শিখার স্পর্শ তো তার প্রিয় স্পর্শ নয়, তবু কেন এমন হল।

আংটি বলল, 'ছি, ও কথা কেন ভাবছ। সামনের দিকে চেয়ে দেখ শিখা, চেয়ে দেখ তোমার দর্শকের দিকে। তাঁরা সবাই তোমার নাম শুনেছেন, নাচ দেখেছেন। তাঁরা সবাই তোমার কাছ থেকে কত আশা করেন। তাঁরা প্রত্যেকে তোমার আপনজন।'

শিখার মনে হল তাই তো, সত্যিই তো। এত বড় সত্য সে ভুলেছিল কি করে? নির্জন বাথরুমে নগ্নদেহে সে যা ভেবেছিল, তা তো ঠিক নয়। শিখা শুধু তার নয়, তার আর্ট শুধু তার একার জন্যে নয়, সকলের জন্যে, সকলের জন্যে। শিখা সকলের জন্যে, তার শিল্প সকলের জন্যে। সকলের চিত্তে যে নটিনী সুপ্ত আছে, গুপ্ত আছে শিখার নূপুরনিক্কণে সে যদি জেগে না উঠল, তার জীবন ব্যর্থ, শিল্প ব্যর্থ। জীবন আর শিল্প অঙ্গাঙ্গী, স্রস্টা আর ভোক্তা অঙ্গাঙ্গী।

আংটির গান দিয়ে অনুষ্টান শুরু হল,—'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।'

গাইবার আগে আংটি বলেছিল, 'তোমাদের পালার সুর তো আলাদা। আমার এ গান কি মানাবে?'

শিখা জবাব দিয়েছে, 'নিশ্চয় মানাবে। শুরুতে বিরহ শেষে মিলন, আমাদের পালাও তো তাই।'

চমৎকার জমলো আংটির গান। সভামণ্ডপ মুগ্ধ হয়ে রইল সুরলালিত্যে আর কণ্ঠমাধুর্যে। রঙ্গনার আজকের কৃতিত্ব আগের দিনকে ছাড়িয়ে গেছে।

এবার শিখাদের পালা। কিন্তু নাচ শুরু হবার আগে তীরের খোঁচার মতো আবার এক তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল শিখা। সব যেন ছিঁড়ে পড়বে। বুঝতে পারল সব। তার গভীর অভ্যন্তরে আর একটি প্রাণ নেচে উঠেছে। সে শিখাকে একা নাচতে দেবে না। সে তার সঙ্গে নাচবে। শিখা একবার ভাবল, 'পালাই, ধরা দিই, স্বীকার করি। জোর হাতে ক্ষমা চাই দর্শকদের কাছে।' কিন্তু পরক্ষণেই গভীর লজ্জা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। পরমুহূর্তেই শ্রীধর রাও এসে তার হাত ধরলেন, 'চল শিখা। এ কি, তুমি ভয় পাচ্ছ ?'

শিখা বলল, 'ভয় কিসের, আপনি যখন আছেন।'

শ্রীধর রাও হেসে বললেন, 'এখন আব আপনি নয়, তুমি।'

শিখা বলল, 'বেশ তাই হবে। তুমি যখন আছ তখন আর ভয় কিসের।'

মনে মনে বলল, আমার শিল্পের দেবতা, আমার নটরাজ, আমার নটেশ্বর, হৃদয়েশ্বর, তুমি যখন আছ আমার কোন ভয় নেই।

শিখার দলের পুরনো সঙ্গীরা সবাই উইংসের আশেপাশে রয়েছে। তার মেক্-আপ ম্যান, তার পার্টনার দিব্যেন্দু, তার তবলচী বেণু সবাই বলল, 'কোন ভয় নেই শিখাদি আমরা আছি, আমরা সবাই আছি।'

আছে বইকি। শিল্পের দেবতা নটরাজ প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন।

পালা আরম্ভ হল। নাচ আরম্ভ হল। সেই পুরনো পালা। রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার সেই পুরনো কাহিনী। শ্রীধর রাও প্রচলিত লোককথা থেকেই তার কাহিনী নিয়েছেন। সাধারণ মানুষের রসলোক থেকে নিয়েছেন রাধাকে। তাঁর শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ নয়, গীতার প্রবক্তা নয়, কুরুক্ষেত্রের চক্রধারী নয়, শুধু বৃন্দাবনের বংশীধারী, রাসকুঞ্জ-বিহারী।

পিছনে কণ্ঠসঙ্গীত নেই, শুধু যন্ত্রসঙ্গীত আছে। তাঁর দলের তবলচী আর তার যন্ত্রীরা। সেতার, বেহালা, এস্রাজ, মৃদঙ্গ আর একটি বাঁশী।

পালা এগিয়ে চলল। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেছেন শ্রীকৃষ্ণ। সে কথা গোপন নেই। সখীরা, গোপিনীরা সবাই জেনেছে সেই লজ্জার কথা। জানিয়েছে রাধাকে। ছিঃ রাধা, ছিঃ। যার জন্যে তুমি সর্বস্ব দিলে, কুল দিলে, মান দিলে, সেই প্রবঞ্চক, সেই সর্বস্বহরা হরি যে তোমাকে কিছুই দিলে না। তুমি যা দিয়েছ ফিরিয়ে আন, ফিরিয়ে আন। অভিমানিনী রাধা নিজে ফিরে আসেন, কিন্তু মন ফেরাতে পারেন না। মান এক কথা বলে, মন আর এক কথা বলে। সখীরা তো জানে না, যা দেওয়া যায় তা ফেরত নেওয়া কঠিন। নিতে গেলে আরো দিতে হয়। সে তো শুধু কুল নয়, মান নয়, প্রাণ দিয়েও কি নিস্তার আছে। রাধা যান না কৃষ্ণের কাছে। কিন্তু মনে মনে নাম জপেন। বলেন, 'না এসে তুমি যাবে কোথায়। তুমি যে আমার মধ্যেই আছ, তুমি যে আমার আধ-খানা হয়ে আছ। আমাকে ছাড়া তুমি যে পূর্ণ নও, তুমিও যে আধা।'

কৃষ্ণ আসেন না। দ্বিধায় দোলেন রাধা। সন্দেহ সংশয়ের ঝড় বয়। বেদনায় ছিঁড়ে যায় হৃদয়। এ তো শুধু কুলের বাঁধন ছেঁড়া নয়, তার চেয়েও বড় ব্যথা প্রেমের বাঁধন ছেঁড়ায়। তাতে যে বিশ্বাসের বাঁধন ছেঁড়ে। আশা, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস, আর আশ্বাসের বাঁধন ছেঁড়ে। নৈরাশ্য যে সব কেড়ে নেয়, সব কেড়ে নেয়।

প্রাণ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন রাধা। যদি তাকে না পাওয়া গেল, তার প্রেমই যদি না পাওয়া গেল, তবে জীবনে রইল কি। নিষ্প্রেম হওয়া যা, নিষ্প্রাণ হওয়াও তাই।

যমুনার কালো জলে প্রাণ দেবেন রাধা। কালো জল কালোমানিকের চেয়ে অনেক শীতল। তাতে কোন জ্বালা নেই। রাধা জলে নামতে

যাচ্ছেন, কৃষ্ণের বাঁশী বেজে উঠল। রাধা দুহাতে কান ঢাকলেন, 'শুনব না, শুনব না।' বাঁশী ফেলে দিয়ে কৃষ্ণ এসে হাত ধরলেন। রাধা হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে গেলেন, 'ছোঁব না, ছোঁব না। তুমি ব্যভিচারী, তুমি কপট লম্পট। তুমি ছুঁয়ো না, তুমি ছুঁয়ো না আমাকে।'

কৃষ্ণ তখন নতজানু হয়ে পা ধরলেন, বললেন, 'ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই। সকলের মধ্যে তোমাকে চাই রাধা, আর কাউকে নয়। আমার ভুল হয়েছিল। ভেবেছিলাম ষোল শ গোপিনী বুঝি আলাদা আলাদা। তাঁদের এক এক জনের এক এক স্বাদ, এক এক রূপ, এক এক রঙ। কিন্তু গিয়ে দেখলাম সব একাকার। তখন বুঝতে পারলাম রাধা তোমার একার মধ্যেই সব আছে। তোমার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ষোল শ—শুধু ষোল শ নয়, ষোল সহস্র, ষোল কোটি—অসংখ্য অনন্ত বিচিত্ররূপিনী নারী। তাকেই খুঁজে নিতে হবে। সেই একের মধ্যে অনেকের স্বাদ পেতে হবে আমাকে। নইলে অনেকের মধ্যে আমি কেবল এক স্বাদই পাব। বার বার আমার ভুল হবে জানি। বার বার সেই ষোল শ আমাকে টানবে। তবু বার বার আমি ফিরে আসব তোমার কাছে। আসব যেখানে আমার রাধা আছে।'

রাধা এবারের মতো ক্ষমা করলেন তাঁকে। ক্ষমা-দণ্ডই বড় দণ্ড। কৃষ্ণ আবার তাঁর বাঁশী কুড়িয়ে নিলেন। হাসি ফুটল দুজনের মুখে। হাসিমুখে সখীরা এসে ঘিরে ধরল। রাসমঞ্চে উঠলেন শ্রীরাধা। নৃত্যপরা গোপিনীরাও এল। কিন্তু রাসেশ্বরী রাধিকা রইলেন একেশ্বরী, হৃদয়েশ্বরী হয়ে।

ভাষা নয়, সুর নয়, শুধু ভঙ্গির মধ্যে এই পুরনো-কাহিনীকে নতুন করে রূপ দিলেন শ্রীধর রাও। ঘুঙুর নূপুর বাজতে লাগল পায়ে পায়ে, তার সুর বাজতে লাগল হৃদয়ে হৃদয়ে।

শিখা আর শ্রীধরের মধ্যে মূর্ত হলেন রাধাশ্যাম।

দর্শকদের পিছনের সারি থেকে কেউ কেউ বিরূপ সমালোচনা করল। এ তো কৃষ্ণলীলা নয়, এর মধ্যে রাসলীলার নামগন্ধও নেই; এ নাট্য শ্রীধর রাওয়ের নিজের লীলা। রাধাকৃষ্ণের নাম দুটি রেখে কাহিনীর অনেক জায়গায় তিনি নিজে বানিয়ে নিয়েছেন। কেউ কেউ বলল, 'তা হোক। ঠিক মতো বানাতে পেরেছেন কিনা, মানাতে পেরেছেন কিনা সেইটাই হল আসল কথা। রাধাকৃষ্ণের মুখ দিয়ে এর আগেও সবাই যার যার নিজের কথা বলেছেন। শ্রীধর রাওই বা বলবেন না কেন।'

কিন্তু কাহিনী যাই হোক, নাচ দেখে সবাই খুশী হল, সবচেয়ে আশ্চর্য হল শিখার কৃতিত্বে। লালিত্যে, লাবণ্যে, ছন্দে, সুষমায় বিভিন্ন মুদ্রার ব্যঞ্জনাময় সঙ্কেতে সে যেন শ্রীধর রাওকেও ছাড়িয়ে গেছে। নিজের খ্যাতিকেও অতিক্রম করেছে শিখা। সবাই স্বীকার করল 'রাধা' তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। শ্রীধর রাও নিজে তাকে অভিনন্দন জানালেন। বললেন, 'তোমার কাছে আবার নতজানু হচ্ছি শিখা। এবার আর শ্রীধর রূপে নয়, রাও রূপে।'

আসর ভাঙল। শ্রীমন্ত বাবুরা আর্টিস্টদের জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। শিখা বলল, 'আমার গাড়িতে শুধু আংটিদি থাকবে। আর কারো আমার দরকার নেই।'

আংটি গাড়িতে উঠে তার নাচের সুখ্যাতি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু শিখা হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরল, 'ভারি খারাপ লাগছে, ভারি যন্ত্রণা হচ্ছে আংটিদি। উঃ।'

আংটি ভয় পেয়ে বলল, 'তাহলে চল, তোমাকে আগে হাসপাতালে নিয়ে যাই। ছিঃ শিখা, আজ তোমার মোটেই নাচা উচিত হয় নি।

তুমি কেন আগে বললে না। আমরা সব বন্ধ রাখতাম। ড্রাইভার, হাসপাতালে চল।'

কিন্তু শিখা কিছুতেই হাসপাতালে যেতে চাইল না। সে আগে বাড়ি যাবে। বাড়ি গিয়ে তার বিচ্ছুকে দেখবে।

হেমারেজ শুরু হয়েছে, রক্তবর্ণ হয়ে গেছে সবুজ রঙের শাড়ি। ড্রাইভারের সাহায্যে কোনরকমে ধরাধরি করে শিখাকে তাদের ওপরের ঘরে নিয়ে গেল। শুইয়ে দিল বিছানায়। ফোন করে দিল প্রদোষকে আর ডাক্তারকে। তারপর শিখার শিয়রের কাছে বসে মাথায় হাত রেখে বলল, 'ভয় নেই শিখা, ভয় নেই।' মুখে বলল বটে ভয় নেই, কিন্তু তার বুক কাঁপতে লাগল থরথর করে।

পদ্মা এসে কাছে দাঁড়াতে শিখা চোখ মেলল, বলল, 'বিচ্ছু কোথায়?'

পদ্মা বলল 'ঘুমোচ্ছে।' শিখা বলল 'ঘুমোক, ওকে আর জাগিয়ে কাজ নেই।'

আংটি বলল, 'খোকনদাকেও খবর দিয়েছি। সেও এল বলে।'

শিখা একটু হাসল, 'এবার আসবে। এবার আর রাগ করে দূরে সরে থাকতে পারবে না।'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রদোষ এসে পড়ল। তার আগেই এসেছে ডাক্তার সোম। প্রদোষ গাড়িতে করে আর একজন ডাক্তারকে নিয়ে এসেছে। সোম আর সেন দুজনেই শিখাকে পরীক্ষা করে মুখ ভার করলেন। ওষুধ আর ইনজেকসন আনতে পাঠালেন। প্রদোষকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, 'উনি নাকি নাচতে গিয়েছিলেন? এ অবস্থায় ওঁকে নাচতে পাঠালেন কেন?

প্রদোষ বলল, 'আমি পাঠাই নি। ও নিজেই গেছে। আমি বাধা দিয়েছিলাম।'

ডাঃ সেন আরও জোর ধমক দিলেন, 'বাধা মানে? কেন জোর করে ধরে রাখলেন না, বেঁধে রাখলেন না?'

দুজনেই বললেন, 'হাসপাতালে পাঠানো দরকার। অপারেশান ছাড়া উপায় নেই।'

কিন্তু শিখা এই রাত্রে কিছুতেই যাবে না। কাল ভোরে যাবে।

সোম আর সেন পরামর্শ করে ঠিক করলেন আজকের রাতটা পেশেণ্টকে নাড়াচাড়া না করে বাড়িতে রাখা মন্দ নয়। তাছাড়া এই শেষরাত্রে হাসপাতালে পাঠিয়েই বা কি হবে। আজ তো আর অপারেশন হবে না। মর্ফিয়া দিয়ে ফেলে রাখবে। তার চেয়ে এখানে যদি মানসিক শান্তিতে থাকে সেই ভালো। ওষুধ আর ইনজেকসন দিয়ে তাঁরা চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শিখা। তারপর ফের ছটফট করে উঠল। টেম্পারেচার রাইজ করেছে আরো। প্রলাপ শুরু হল শিখার। 'আমি মরতে চাই নে, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও। আংটিদি আমাকে বাঁচাও, প্রদোষ আমাকে বাঁচাও। আমি মরব না, কিছুতেই মরব না।'

আবার হেমারেজ শুরু হয়েছে, রক্তবন্যা আটকায় নি ইনজেকসন ওষুধের বাঁধে।

প্রদোষ ছুটে ফের ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিল, শিখা ওর হাত টেনে ধরল, 'তুমি যেয়ো না, তুমি আর আমার কাছ থেকে চলে যেয়ো না।'

প্রদোষ বলল, 'আমি নিজে যাব না, ডাক্তারের কাছে লোক পাঠিয়ে এক্ষুনি ফিরে আসছি।'

ঘর থেকে প্রদোষ বেরিয়ে গেলে শিখা বলল, 'আংটিদি, একটা কথা।'

আংটি বলল, 'কি কথা বোন।'

শিখা বলল, 'আমি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম, সুদ সমেত তার সবই ফেরত দিয়ে গেলাম। আমার বিচ্ছুকে দেখো।'

আংটি বলল, 'ছি শিখা, তুমি যদি ফের ওই সব কথা বল আমি এখুনি উঠে চলে যাব। তোমার কোন ভয় নেই। তুমি ফের সেরে উঠবে। অপারেশনের পর তুমি নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবে।'

পাশের ফ্লাটের চাকরকে ডেকে তুলে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে প্রদোষ ফিরে এল।

শিখা বলল 'আমার কাছে এস।'

প্রদোষ এগিয়ে গিয়ে বসল।

তারপর শিখার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল। ঘরে যেন আর কেউ নেই। আংটি তা লক্ষ্য করে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। শারীরিক যন্ত্রণায় শিখার কথা বলবার শক্তি নেই, প্রদোষও নির্বাক, অনেক দিনের অনেক কথা তার মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে। কিন্তু প্রকাশের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। যৌথ জীবনের কত দিনের কত রঙীন মুহূর্ত, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, মিলন বিচ্ছেদের কত বিচিত্র ও স্মৃতিচিহ্ন প্রদোষের চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

শিখা কিছুক্ষণ পরে প্রদোষের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আমার একটা কথা বিশ্বাস করবে?'

প্রদোষ বলল, 'তোমার সব কথা বিশ্বাস করব শিখা।'

শিখা বলল, 'আমি এ চাই নি। আমি মরবার জন্যেও যাই নি, আমি বাঁচার আনন্দেই নাচতে গিয়েছিলাম। তোমরা আমাকে দোষ দিয়ো, আমার আর্টকে দোষ দিয়ো না। তোমরা—।'